রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

প্রসঙ্গ কথা

স্বাগত বক্তৃতা: প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ৫ অক্টোবর পালিত হয়ে থাকে। ১৯৬৬ সালে শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে শিক্ষকদের মর্যাদা ও দায়িত্বের বিষয়ে একটি সুপারিশমালা গৃহীত হয়েছিল। এর ২৮ বছর পর ১৯৯৪ সালের ৫ অক্টোবর প্রথমবারের মতো পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এখন প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০২২ সাল থেকে দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হচ্ছে । এ বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে দিবসটি গুরুত্বসহকারে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্বিতীয়বারের মতো এবার এই দিবসটি পালন করে।

এই বছরের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি বা Recasting teaching as a collaborative profession। সভ্যতার শুরু থেকে শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ চলছে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষা দান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হয়েছে ও হচ্ছে। এ এক চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা দান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিয়ে এ এক সমন্বিত বা মিলিত প্রচেষ্টা। শিক্ষকতা এক মহান পেশা। এই মর্যাদার দাবি মূলত দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে একজন শিক্ষকের মহৎ ভূমিকার জন্য। শিক্ষকতা পেশার মহান ভূমিকা বিবেচনায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এই দিবসটি ইউনেস্কো ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন কৃতবিদ্য শিক্ষককে সম্মাননা জানানো হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষকতা পেশাকেও আরেকবার মর্যাদায় অভিসিক্ত করা হচ্ছে। আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য 'টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা' এবং স্কুল পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য 'আমার প্রিয় শিক্ষক' ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য 'আদর্শ শিক্ষক' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ট্রিপল ব্লাইন্ড পদ্ধতিতে বিচারকদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত তিনটি করে রচনা আজ পুরস্কৃত হতে যাচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির একটি মাত্র রচনা পাওয়া যায়। সেটি যথাযথ মানসম্পন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় পুরস্কৃত হচ্ছে। আমি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন মজুমদার
প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর
ও
সদস্য-সচিব
বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন কমিটি

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এর আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য, ঈষৎ সম্পাদিত

বিশেষ নিবন্ধ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫: শিক্ষক মর্যাদা, মিলন ও মানবিকতার নবজাগরণ

ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম
প্রফেসর ইমেরিটাস, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১। ভূমিকা

২০২৫ সালের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য- 'শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি'-- এই পেশার বহুমাত্রিকতা ও সম্মিলিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। বিশেষত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায়, যেখানে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও মানবিকতা গড়ে ওঠে, সেখানে এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস কেবল একটি দিন নয়। এটি একটি প্রতিশ্রুতি, একটি উপলব্ধি, একটি আহ্বান। এই দিনটি শিক্ষকদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি এবং জাতি গঠনে তাদের অনন্য অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক মহৎ উপলক্ষ্য। শিক্ষক শুধু পাঠদান করেন না; তাঁরা নৈতিকতা, মূল্যবোধ, নেতৃত্ব এবং মানবিকতা শেখান। তারা মানুষ গড়েন, জাতি গড়েন।

ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষক দিবস একটি উৎসব, একটি স্মরণীয় দিন। কিন্তু এই দিনটির তাৎপর্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি সেই শিক্ষকদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান জানাবার দিন, যাঁরা আমাদের শুধু পাঠ্যবই শেখাননি, বরং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখিয়েছেন।

একজন শিক্ষক ছাড়া জীবনের পথচলা যেন দিশাহীন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো শিক্ষক আছেন, যিনি আমাদের চিন্তা, চরিত্র ও চেতনার ভিত্তি নির্মাণে সহায়তা করেছেন। ঘরে, বাইরে, প্রকৃতির মাঝে প্রতিনিয়ত আমরা শিখছি। আর এই শেখার পথের আলোকবর্তিকা হলেন শিক্ষক। একজন প্রকৃত শিক্ষকই পারেন একজন মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে, জীবনের সিঁড়ি বেয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে।

২। শিক্ষকতা: মহান পেশা, কিন্তু সংকটগ্রস্ত মর্যাদা, নৈতিকতা

শিক্ষকতা একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এটি মর্যাদা ও নৈতিকতার প্রতীক। জাতি গঠনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষকতা কোনো চাকরি নয়, এটি একটি আদর্শিক দায়িত্ব। একজন শিক্ষক জাতির বিবেক জাগিয়ে তোলেন, ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করেন, সমাজকে আলোকিত করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষকের অপমান, এটি শুধু অনৈতিক নয়, এটি জাতির আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত।

বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে স্বৈরাচারের গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত উচ্চশিক্ষা, এক নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মেরুদণ্ড প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব খবর আলোড়ন তুলেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা, এমনকি অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হওয়া। এই ঘটনাগুলো শুধু শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অপমান নয়, বরং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এক নির্মম আঘাত।

স্বৈরাচারের সময় থেকে শুরু হয়ে সাম্প্রতিককালের সংঘটিত শিক্ষকদের ওপর হামলা, অপমান এবং সামাজিক অবমূল্যায়নের ঘটনা আমাদের ব্যথিত করে। আবার একই সঙ্গে, কিছু শিক্ষকের নৈতিক বিচ্যুতি ও অযোগ্যতা শিক্ষার গুণগত মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এসব নৈতিক ও আদর্শিক বিচ্যুতি আমাদের সমানভাবে উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে। কারণ, শিক্ষকরাই জাতি গড়ার কারিগর। তারা যদি আদর্শচ্যুত হন, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিগত আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকই পর্যাপ্ত যোগ্যতা, উচ্চশিক্ষা বা ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। গাম্ভীর্যকে ভুলভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সাথে মাঝে মধ্যে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ শোনা যায়, যা শিক্ষকতার আদর্শের পরিপন্থি। এই বাস্তবতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– শিক্ষকতা পেশার যথাযথ মূল্যায়ন, নৈতিক উন্নয়ন ও পেশাগত মানোন্নয়ন ছাড়া শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

৩। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের সংকট: মর্যাদার পুনরুদ্ধারে মিলিত প্রয়াস

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনমন একটি গভীর সংকট, যা কেবল শিক্ষাব্যবস্থাকে নয়, পুরো জাতিকে দুর্বল করে তুলছে। শিক্ষকের সংকট মানেই জাতির সংকট। শিক্ষক অবমাননার সংস্কৃতি যদি চলতেই থাকে, তবে সমাজে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা বিলুপ্ত হবে। প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান- সব ক্ষেত্রেই স্থবিরতা আসবে। কারণ শিক্ষকই হলেন সেই স্নায়ুতন্ত্র, যার মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ডে প্রাণ সঞ্চার হয়।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের যে অবক্ষয় ঘটেছে, তা নিছক প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়- এটি স্বৈরাচারের আমলে আমাদের সমাজের নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। এই অবনমন শুধু শিক্ষার মান নয়, শিক্ষকের মর্যাদা ও শিক্ষার্থীর মানবিক বিকাশকেও বিপন্ন করেছে।

অযোগ্যতার প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকতার মর্যাদাহানি: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রবণতা শিক্ষার পবিত্রতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

- স্বৈরাচারের আমলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগ্যতা, গবেষণা ও নৈতিক দৃঢ়তার বদলে দলীয় সুপারিশে নিয়োগ হয়েছে, যা শিক্ষকতার আদর্শকে ক্ষুণ্ন করেছে।
- এসব অযোগ্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা নয়, বরং বিভ্রান্তি ও পক্ষপাতের উৎস হয়ে উঠেছেন।
- ফলে শিক্ষকতার গাম্ভীর্য হারিয়ে গিয়ে সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনাস্থা ও দূরত্ব।
- জ্ঞানচর্চার বদলে ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যচ্যুতি ঘটেছে, সৃজনশীলতার সুযোগ কমেছে।
- ছাত্র রাজনীতির অপব্যবহারে শিক্ষার পরিবেশে ভয় ও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র রাজনীতি, যা একসময় নেতৃত্ব ও মূল্যবোধের চর্চার ক্ষেত্র ছিল, তা আজ অনেকাংশে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।
- ক্যাম্পাসে সিট দখল, ভর্তি বাণিজ্য, টেন্ডার নিয়ন্ত্রণের মতো কর্মকাণ্ড শিক্ষার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। শিক্ষকরা স্বাধীনভাবে পাঠদান ও গবেষণা পরিচালনার সুযোগ হারিয়েছিলেন, আর শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে।
- পাঠ্যক্রমের মান কমেছে, গবেষণার গতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এগোয়নি, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে পড়েছে আমাদের উচ্চ শিক্ষা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হয়ে উঠেছে বিভক্ত, সন্দেহভাজন ও অনুৎসাহী।

নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক দায়: শিক্ষিত মানুষের অনৈতিক আচরণ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আজ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। নৈতিক শিক্ষার অভাব জাতিকে বিকৃত রুচির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিছু মানহীন শিক্ষকের জন্য উদ্‌বেগ বাড়ছে, যারা দায়িত্বহীন আচরণে শিক্ষার্থীদের হতাশ করছেন।

উত্তরণে সম্মিলিত নৈতিক পুনর্জাগরণ: আলোচ্য সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব, যদি আমরা সম্মিলিতভাবে সচেতন হই, নৈতিকতা ও যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিই এবং শিক্ষাকে তার প্রকৃত মর্যাদায় ফিরিয়ে আনি। প্রয়োজন একটি সম্মিলিত, নৈতিক ও মানবিক উদ্যোগ– আর তা হচ্ছে:

- শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, যোগ্যতা ও গবেষণাভিত্তিক মানদণ্ড নিশ্চিত করতে হবে।
- অবাধ ছাত্র রাজনীতির পরিবর্তে RUCSU-র নেতৃত্ব, মূল্যবোধ ও সেবার চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে পুনর্গঠন করতে হবে।

- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করতে হবে।
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত রাখতে হবে।
- ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা, নৈতিকতা ও অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এ আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত- শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শ্রেণিবৈষম্যহীন মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকতার বহুমাত্রিকতা

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকতা কেবল শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক পেশা যার মধ্যে শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা ও দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বহুমাত্রিকতা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে ফুটে ওঠে:

জ্ঞান প্রদানকারী ও পথপ্রদর্শক: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেন এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তারা কেবল তথ্য সরবরাহ করেন না, বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলেন।

গবেষক ও জ্ঞান সৃষ্টিকারী: উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো গবেষণা। শিক্ষকদের নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হয় এবং আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে তা প্রকাশ করতে হয়, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে অপরিহার্য।

মেন্টর ও পরামর্শদাতা: শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখতে এবং লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত করেন।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনকারী: একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক গুণাবলি এবং সামাজিক সচেতনতা বিকাশে সহায়তা করেন, যা তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

উদ্ভাবক ও শিক্ষণ পদ্ধতির পরিকল্পনাকারী: শিক্ষককে কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা করতে হয় এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শেখার চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি (যেমন: মিশ্রিত শিক্ষা, সহযোগী শিক্ষা) ব্যবহার করতে হয়।

মূল্যায়নকারী ও প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী: শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি শিক্ষক তাদের কাজের গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া (feedback) প্রদান করেন, যা শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক ও মানবিক ভূমিকা: শিক্ষকরা সমাজ গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন।

পেশাগত বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়ন: একজন শিক্ষককে তার নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা ক্রমাগত হালনাগাদ করতে হয় এবং পেশাগত মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকতে হয়। শিক্ষক হবেন জ্ঞানতাপস, সত্যবাদী, নির্মল, এবং আদর্শবান। শিক্ষার্থী হবেন অনুসন্ধিৎসু, শ্রদ্ধাশীল ও সৃজনশীল। আর বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি মুক্ত, নৈতিক ও গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে।

একজন শিক্ষক শুধু পাঠ্যবই শেখান না, তিনি শেখান কীভাবে মানুষ হতে হয়। তিনি ছাত্রের ভেতরের আলো জ্বালান, সমাজকে আলোকিত করেন। তাই তাঁকে অসম্মান করা মানে নিজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া। বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এ আমাদের উচ্চারণ হোক- 'তাঁকে সম্মান করো, যাঁর কাছ থেকে তুমি জ্ঞান অর্জন করো।' কারণ শিক্ষক আছেন বলেই আমরা আছি, সমাজ আছে, সভ্যতা আছে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার দীপ্তি, দায়বোধ ও মর্যাদার পুনরাবিষ্কার

শিক্ষকতা কোনো সাধারণ পেশা নয়- বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এটি এক অন্তর্দর্শনের সাধনা। এখানে জ্ঞান শুধু অর্জিত নয়, নির্মিত হয়। একজন শিক্ষক কেবল পাঠদাতা নন, তিনি ছাত্রের চিন্তা, চরিত্র ও চেতনার নির্মাতা। বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, শিক্ষকতা একটি জাতিগঠনের নৈতিক অঙ্গীকার- যার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিকতা।

শিক্ষকতার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা থেকে নেতৃত্ব নির্মিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হলো চিন্তার মুক্তাঞ্চল, যেখানে শিক্ষকরা ছাত্রদের শুধু পাঠ্যবই শেখান না, বরং তাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করেন, প্রশ্ন করতে শেখান এবং উত্তর খুঁজে পেতে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা ভবিষ্যতের নেতৃত্ব গড়ে তোলেন- যা সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে আলোকিত করে। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্রের ভেতরের আলো জ্বালিয়ে দেন, তাকে মানুষ করে তোলেন।

❖ শিক্ষকের অধিকার: মর্যাদা ও নিরাপত্তার ভিত্তি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়- এটি একটি ব্রত, একটি নৈতিক অঙ্গীকার, একটি জাতি গঠনের মৌলিক ভিত্তি। বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ আমাদের সামনে এই প্রশ্নটি আবারও তীব্রভাবে তোলে: আমরা কি আমাদের শিক্ষকদের যথার্থ মর্যাদা দিচ্ছি? নাকি আমরা এমন এক সমাজে পরিণত হয়েছি, যেখানে জ্ঞানের বাতিঘরকে নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন চলছে নীরবে, কখনো কখনো প্রকাশ্যেই?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কেবল প্রয়োজন নয়, এটি একটি ন্যায্য দাবি। কম বেতন, সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং অনিশ্চয়তা তাদের পেশাগত মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়। একজন শিক্ষক যদি জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সংগ্রাম করেন, তাহলে তিনি কীভাবে ভবিষ্যতের নির্মাতা হবেন? তাই ন্যায্য বেতন, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ও পেনশনসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার প্রাণ হলো চিন্তার স্বাধীনতা। গবেষণা, মতামত প্রকাশ এবং পাঠদানের পদ্ধতিতে স্বাধীনতা না থাকলে জ্ঞানচর্চা সংকুচিত হয়। এই স্বাধীনতা অবশ্যই নৈতিকতা ও সমাজকল্যাণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। একজন শিক্ষক যেন ভয় নয়, সাহস নিয়ে সত্য উচ্চারণ করতে পারেন- এটাই পেশাগত স্বাধীনতার মূল সৌন্দর্য।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মানেই একজন গবেষক। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সমস্যার সমাধান- এসবই গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব। কিন্তু গবেষণার জন্য প্রয়োজন সময়, অনুদান, পরিকাঠামো ও নীতিগত সহায়তা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণ না হলে জ্ঞানচর্চা স্থবির হয়ে পড়বে।

❖ শিক্ষকের কর্তব্য: আদর্শের আলোকবর্তিকা

একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল পাঠ্যবই শেখান না, তিনি নিজের আচরণে নৈতিকতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন। তার জীবনই শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জন্য একটি জীবন্ত পাঠ।

শিক্ষার মান উন্নয়ন তথা শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষকই প্রধান চালিকাশক্তি। পাঠদানের পদ্ধতি, মূল্যায়নের ধরণ এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বিকাশে শিক্ষককে সদা সচেষ্ট থাকতে হয়। পরীক্ষার ফল নয়, বরং সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা- এই গুণগুলো গড়ে তোলাই শিক্ষকের প্রকৃত দায়িত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কেবল পাঠদাতা নন, তিনি একজন গবেষক, চিন্তাবিদ, পরামর্শদাতা এবং মূল্যবোধের বাহক। গবেষণাগার পরিচালনা, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাপত্র প্রকাশ এবং হাতে-কলমে শেখার সুযোগ- সবই শিক্ষকতার অংশ। শিক্ষক নিজে গবেষণা করবেন, আবার শিক্ষার্থীদেরও গবেষণায় উৎসাহিত করবেন- এই দ্বৈত ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। গবেষণার পরিবেশ, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া উচ্চশিক্ষা পূর্ণতা পায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদে শিক্ষকরা নতুন উপকরণ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।

সমাজবিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় প্রশাসনে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল, সৃজনশীল ও নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, পেশাগত দিকনির্দেশনা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষককে সহানুভূতিশীল ভূমিকা পালন করতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্রের পাশে থাকেন- শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, জীবনের প্রতিটি সংকটে।

৬। মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি: একটি সম্মিলিত যাত্রা

'মিলিত প্রচেষ্টা' বলতে বোঝায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসন, শিল্পখাত ও সমাজের সমন্বিত অংশগ্রহণ। এই সম্মিলন ছাড়া উচ্চশিক্ষা পূর্ণতা পায় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ উদ্ভাবক তৈরি। আর প্রশাসনের ভূমিকা ও প্রশাসনিক সহায়তার মাধ্যমে গবেষণা অনুদান, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে একটি সম্মিলিত যাত্রা শুরু হবে। শিল্প ও সমাজের প্রকৃত সংযোগের ফলে বাস্তব সমস্যার সমাধানে গবেষণায় অগ্রসর হতে পারলে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাবে। মিলিত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় যৌথ প্রকল্পে অংশগ্রহণে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়।

সম্ভাবনার দ্বার: প্রযুক্তি, অনুদান ও আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য বেশ কিছু সম্ভাবনাময় সুযোগ তৈরি হয়েছে:

- ডিজিটাল শিক্ষা: Zoom, Moodle, Google Classroom, PhET, Quantum ESPRESSO, etc
- ইত্যাদি টুল ব্যবহার করে পাঠদান ও গবেষণা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বাস্তবমুখী।
- গবেষণা অনুদান: UGC, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, DAAD, Fulbright, Erasmus+ ইত্যাদি থেকে অনুদান ও ফেলোশিপ।
- পেশাগত উন্নয়ন: Coursera, edX, NPTEL-এর মাধ্যমে শিক্ষকরা নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন।
- আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা: 'AI in Healthcare', "Science Communication"-এর মতো ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্স চালু করে শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক দক্ষতা গড়ে তোলা সম্ভব।

[PhET provides fun, free, interactive, research-based science and mathematics simulations. It can extensively test and evaluate each simulation to ensure educational effectiveness. These tests include student interviews and observation of simulation use in classrooms. The simulations are written in HTML5 (with some legacy simulations in Java or Flash), and can be run online or downloaded to your computer. All simulations are open source (see source code). Multiple sponsors support the PhET project, enabling these resources to be free to all students and teachers.
Moodle is a Learning Platform or Learning Management System (LMS) - a free Open Source software package designed to help educators create effective online ...]

❖ **চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি: বাস্তবতা ও প্রতিবন্ধকতা**

মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি আর্জনের জন্য একটি সম্মিলিত যাত্রার সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জও রয়েছে যা অতিক্রম করতে হবে। চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে:

- অপর্যাপ্ত অর্থায়ন: গবেষণা ও ল্যাব উন্নয়নে বাজেটের অভাব,
- প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা: উচ্চগতির ইন্টারনেট, ক্লাউড কম্পিউটিং, আধুনিক ল্যাবের অভাব,
- পাঠ্যক্রমের অপ্রাসঙ্গিকতা: শিল্পখাতের চাহিদার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম,
- অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব: গবেষণা ও পাঠদানে সময় কমে যায়,
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত: শিক্ষক সংকটে শিক্ষার মান কমে যায়,
- নৈতিক বিচ্যুতি ও সামাজিক অবমূল্যায়ন: শিক্ষক সমাজের একটি অংশের আদর্শচ্যুতি এবং সমাজের পক্ষ থেকে অবমাননা- উভয়ই শিক্ষার ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরূপ।

❖ ভবিষ্যতের দিশা: একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ জরুরি:

- পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ,
- গবেষণা অনুদান ও আধুনিক ল্যাব সুবিধা সম্প্রসারণ,
- শিক্ষা-শিল্প সংযোগ জোরদার করা ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণে বিনিয়োগ,
- শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,
- আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি,
- নৈতিকতা ও আদর্শচর্চায় শিক্ষক সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করা,
- শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও অপমানের বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থান গ্রহণ।

৭। উপসংহার

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, শিক্ষকতা একটি সম্মিলিত যাত্রা। 'মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি' তখনই সম্ভব, যখন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসন ও সমাজ একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এই দীপ্তি তখনই সত্যিকার অর্থে উজ্জ্বল হবে, যখন শিক্ষকরা হবেন নৈতিক, আদর্শবান ও সমাজের শ্রদ্ধাভাজন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সম্মিলন গড়ে তুলতে পারলে, আমরা পাব একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, গবেষণাভিত্তিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা- যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শুধু দক্ষ নয়, বরং মানবিক ও সৃজনশীল করে তুলবে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ আমাদের এই কথাই মনে করিয়ে দেয়- শিক্ষকের সম্মান কেবল একদিনের আয়োজন নয়, এটি হওয়া উচিত প্রতিদিনের সংস্কৃতি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের উৎস, তাদের আলোকিত পথেই জাতি এগিয়ে যায়। তাই তাদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি আমাদের সম্মান ও সচেতনতা থাকা জরুরি। শিক্ষককে সম্মান করো, যাঁর কাছ থেকে তুমি জ্ঞান অর্জন করো- এই বাক্যটি যেন শুধু একটি উক্তি না হয়ে ওঠে, বরং আমাদের জাতীয় চেতনার অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষক পরিচিতি

ড. মু. আযহার উদ্-দীন

সম্মাননা প্রদান: প্রফেসর মু. আযহার উদ্-দীন

ড. মু. আযহার উদ্-দীন ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাংকাস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এর আগে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নাটরের নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা কলেজ ও রাজশাহী কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন।

১৯৯২ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব ও একই বছরের আগস্ট থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনে তিনি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও বিভাগীয় সভাপতিসহ অন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

ড. এম নজরুল ইসলাম

ড. এম নজরুল ইসলাম পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ১৯৬৭ সালে এমএসসি (থিসিস) ডিগ্রি অর্জন করেন ও ১৯৭২ সালে যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন।

১৯৬৮ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে ও ১৯৮৬ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি লিবিয়ার আল ফতেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্মাননা প্রদান: প্রফেসর মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

তিনি বিজ্ঞান অনুষদের অধিকর্তা, শহীদ শামসুজ্জোহা হলের প্রাধ্যক্ষ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি, সিনেট, সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য; কেন্দ্রীয় কাফেটেরিয়ার শিক্ষক-উপদেষ্টা, পরিবহন দপ্তর ও কম্পিউটার সেন্টারের প্রশাসকসহ অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর বহু সংখ্যক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১০ সালে শিক্ষক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ড. মামনুনুল কেরামত

সম্মাননা প্রদান: প্রফেসর মামনুনুল কেরামত

ড. মামনুনুল কেরামত ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত ১৯৭৬ সালের এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ইন্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস থেকে ফলিত ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন ও ১৯৯৭ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ২০০৫ সালের মে মাসে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন। ২০০৮ সালের মে থেকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উপ-উপাচার্যের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্রক্টর এবং ২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত শহীদ জিয়াউর রহমান হল প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বহু সংখ্যক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১৯ সালে শিক্ষক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

প্রধান অতিথির বক্তব্য: প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একজন মানুষের পেশাগত জীবনে যত পরিচয়ই থাকুক না কেন, শিক্ষকতার পরিচয়ের ঊর্ধ্বে আর কোনো পরিচয় নেই। শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, এটি মানুষ গড়ার এক মহান দায়িত্ব। মানুষের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ এই পেশায়ই সবচেয়ে বেশি। এই অর্থে শিক্ষকতা একটি সৌভাগ্যের বিষয়, এটি সবার ভাগ্যে জোটে না।

এই শিক্ষক সম্মাননা কার্যক্রমটি আমরা গত বছর শুরু করেছি। গত বছর তিনজন যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে আমরা সম্মানিত করার সুযোগ পেয়েছি। এ বছরও তিনজন শিক্ষককে এই সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এই কাজটি করতে পেরে আমরা নিজেরাই অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত, কারণ যাঁদের আমরা সম্মানিত করছি তাঁরা প্রত্যেকেই এই সম্মাননার যোগ্য।

আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষককে আমরা কেবল শিক্ষক হিসেবেই দেখতে চাই। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি চর্চা দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় দেখার প্রবণতা। কিন্তু আমরা সেই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আমাদের কাছে শিক্ষক মানেই শিক্ষক। তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা শিক্ষক।

আমরা চাই, এই সম্মান জানানোর ধারাটি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকুক। যাঁরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, ছাত্রদের জীবন গড়েছেন, বিষয়ের প্রতি সততা ও নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন তাঁরা সবাই সম্মানিত হবেন। এটি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আজ মঞ্চে উপস্থিত তিনজন সম্মানিত শিক্ষকের মধ্যে প্রফেসর নজরুল ইসলাম আমার ক্লাসরুম শিক্ষক। স্যারের একটি কথা আজও আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে। শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটি, আমাদের শেখার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এসব বিষয় অনেক সময় ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়।

আমি ব্যক্তিগত জীবনের একটি কথা শেয়ার করতে চাই। ছাত্রজীবনে এইম ইন লাইফ রচনাটি আজ খুব পরিচিত হলেও, আমি কোনোদিন এটি লিখিনি। কারণ ছোটবেলায় আমি কখনো নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি জীবনে কী হতে চাই। একটা সময় বাসচালক হতে চেয়েছিলাম। আমার মা তখন বগুড়ায় সরকারি কলেজে চাকরি করতেন। তিনি কলেজ থেকে ফিরে বড় কাগজে রঙিন পেন দিয়ে আমার জন্য বাস আঁকতেন। আমি সেই বাসের ড্রাইভার হতাম। সেটাই ছিল আমার স্বপ্ন।

আরেকটা বিষয় হলো আমি কখনো বিতর্কে অংশ নিতে চাইতাম না। কারণ লটারিতে যদি বিপক্ষে পড়ে যেতাম, আমাকে এমন কিছু বলতে হতো যেটা আমি বিশ্বাস করতাম না। আমি যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করাতে পারতাম না। আমাদের ব্যাচে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও রাজশাহী কলেজের সেই সময়ের অনেক বন্ধু আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তারা অনেক রচনা মুখস্থ করত। আমি সেটা পারতাম না। আমার বিশ্বাস ছিল রচনা মানে মুখস্থ নয়, বরং সময়ের মধ্যে নিজের চিন্তা লিখে ফেলা।

এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকেই আজ মনে হয় সুশিক্ষা কী, শিক্ষিত হওয়া মানে কীড় এই প্রশ্নগুলোর জায়গায় আমাদের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলাফল আমরা আজ সমাজে অনুভব করছি। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সংকট আসলে শিক্ষার সংকট, সভ্যতার সংকট।

শেষে আমি আমার ক্লাস টিচার প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যারের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। স্যারের কাছ থেকে আমি শিখেছি ফিজিক্সের মতো বিষয় পড়াতে শুধু গভীর জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, ডায়াগ্রাম ও গ্রাফিক উপস্থাপন কতটা শক্তিশালী টিচিং টুল হতে পারে।

স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে নিখুঁত ডায়াগ্রাম আঁকতেন, স্কেল ঠিক রেখে ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতেন। একটি ডায়াগ্রামের মধ্যেই পুরো অধ্যায়ের সারাংশ তুলে ধরতেন। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন একটি ছবি হাজার শব্দের সমান। ভালো শিক্ষক হতে হলে এই ভাষাটিও শিখতে হয়। আজ এই সুযোগে আমি স্যারের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য, ঈষৎ পরিমার্জিত

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

বিশেষ অতিথির বক্তব্য: প্রফেসর ড. মোহা: ফরিদ উদ্দীন খান

'শিক্ষক' শব্দটা আমাদের কাছে এমন একটি শব্দ, যে শব্দটা আমাদেরকে দারুণভাবে অনুরণিত করে। আমি জানি না, পৃথিবীতে হয়তো এমন কোনো সফল মানুষ নেই, যার সফলতার পেছনে কোনো না কোনো শিক্ষকের অনুপ্রেরণা নেই। নিঃসন্দেহে শিক্ষক হচ্ছে আমাদের সমাজের একটি সম্মানজনক পেশা। একজন শিক্ষক আসলে একজন ছাত্রকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে পারে, তার মধ্যে যে লুকায়িত শক্তি রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে একজন শিক্ষক।

একটা ছোট ঘটনা বলি। ছোটবেলায় আমাদের স্কুলের মাঠে যাত্রা হতো। সে সময় যাত্রার জন্য আমাদের স্কুল বন্ধ থাকত। এমনও হতো যে যাত্রার কয়েকদিন পর পর্যন্ত ওই জায়গায় বাজে গন্ধ থাকত, যার কারণে আমরা ক্লাস করতে পারতাম না। তো আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে পরেরবার থেকে এ যাত্রাপালা হতে দেবো না। আমরা সেটা আমাদের শিক্ষকদের বললাম। তারা আমাদের হ্যাঁ-ও বললেন না, না-ও বললেন না। কারণ স্থানীয় লোকদের একটা ঝুঁকি আছে। কিন্তু তাদের সুবিধার জন্য তারা স্কুলের মাঠেই যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আমরা আয়োজকদের বললাম, কিন্তু তারা আমাদের ধমক দিল এই বলে যে, এখানে প্রতিবছর করি, এটা অনেকদিন যাবৎ হয়ে আসছে। তাও আমরা দমলাম না। যখন প্যান্ডেল হয়ে গেল, তখন আমরা হুট করে প্যান্ডেল ভেঙে দিয়ে ওই জায়গা থেকে পালিয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত ওই যাত্রাটা হলো না। আয়োজকেরা স্কুলের স্যারদের কাছে নালিশ দিলেন যে, যারা এই কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে, তাদেরকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

তারপর স্যাররা আমাদের ডেকে নিয়ে সামনে অনেক বকাঝকা করলেন ঠিকই, কিন্তু তারা আমাদের কোনো পানিশমেন্ট দেননি। কারণ তারাও চাইতেন না এটা হোক। এই রকম অনেক ঘটনা আছে, যেখানে শিক্ষকরা তাঁর ছাত্রের একেবারে ভেতরে ঢুকে যেতে পেরেছেন, তারা কী চায় বা না চায়। যেটা আর কেউ পারে না। একজন ছাত্র যেন সুন্দরভাবে মানুষ হতে পারে, জীবনে সফল হতে পারে, সেইভাবে গাইড করার মানসিকতাটা সব শিক্ষকের মাঝেই থাকা উচিত।

যে সম্মানিত শিক্ষক আজ সম্মানিত হলেন, আমি তাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে যে, নিজের মধ্যে যে আলোটা আছে, সেটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আমার মনে হয় যে তিনজন আজ সম্মানিত হলেন তাঁরা খুব ভালোভাবে এই কাজটা করতে পেরেছেন। আমি মনে করি, শিক্ষক হিসেবে তাঁরা সফল এবং এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এর আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য, ঈষৎ পরিমার্জিত

সভাপতির বক্তব্য

সভাপতির বক্তব্য: প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন

আজকে যে তিনজন মহান শিক্ষককে আমরা সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তাঁরা হলেন প্রফেসর আজহারউদ্দিন স্যার, প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার এবং প্রফেসর মামনুনুল কেরামত স্যার।

প্রো-ভিসি হওয়ার পর প্রফেসর আজহারউদ্দিন স্যার নিজে আমাকে ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছেন। আজ তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আয়োজনকে সমৃদ্ধ করেছেন এর জন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যারের আমি একজন ভক্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর দিন, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে এভাবে গল্প ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে পারেন এমন শিক্ষক আমি আর দেখিনি। আজ তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি।

তিনি আরও বলেন, আমি প্রো-ভিসি হিসেবে যে কক্ষে বসি, সেই কক্ষে আজ সংবর্ধনা পাওয়া তিনজন শিক্ষকের মধ্যে দুজনের ছবি রয়েছে। কারণ প্রফেসর আজহারউদ্দিন স্যার এবং প্রফেসর মামনুনুল কেরামত স্যার, তাঁরা দুজনই পূর্বে প্রো-ভিসির দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রফেসর মামনুনুল কেরামত স্যার আমার কাছে একজন মডেল। উচ্চ দায়িত্বে থেকেও তাঁর সহজ-সরল ও সিম্পল জীবনযাপন আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সে কারণেই আমি তাঁকে একজন মডেল হিসেবে দেখি। আজ তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা নিজেদের সত্যিই ধন্য মনে করছি।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এর আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য, ঈষৎ পরিমার্জিত

আলোচনা সভা : অতিথিবৃন্দ

আলোচনা সভা: শ্রোতৃবর্গ

সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের অনুভূতি

সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষকগণের অনুভূতি প্রকাশ

প্রফেসর মু. আযহার উদ্-দীন

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণী শিক্ষকদের নিয়মিত সম্মাননা দেওয়া উচিত। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা আরও বাড়বে।

আমি ১৯৬৪ সালের ১৩ জানুয়ারি শিক্ষক হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। এর আগে আমি ১৯৬১ সাল থেকে ৩ বছর রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতা করেছি। আমি যেহেতু রাজশাহী কলেজের ছাত্র ছিলাম, সেখানে শিক্ষকতা করা আমার কাছে ছিল অন্যরকম অনুভূতি। এর আগে অনার্স শেষ করে কিছুদিন নাটোর কলেজে শিক্ষকতা করি।

ছোটবেলা থেকেই শিক্ষকতার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। কারণ আমার বাবাও শিক্ষক ছিলেন। অনেক আগে থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারি তাহলে ভালো হয়। যাক, শেষ পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছি। আমার পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের যতটুকু দেওয়ার তার চেষ্টা আমি করেছি।

আমার শিক্ষকতা জীবন ছিল খুবই বৈচিত্রময়। আমি শুধু শিক্ষক হিসেবেই কাজ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার কিছুদিন পর তৎকালীন প্রক্টর প্রফেসর মকবুল হোসেন আমাকে সহকারী প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৬৯ সালে জোহা স্যার যখন প্রক্টর তখন তিনিও আমাকে সহকারী প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলেন এবং আমি তা করি। আমি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধিকর্তা ছিলাম। এসময় *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল* প্রকাশ করি। জার্নালটি এখনো প্রকাশিত হচ্ছে।

কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব, বিভাগের সভাপতি ও ১৯৮৬ সালে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলাম। আমি শুধু শিক্ষকতাই করিনি, প্রশাসনের অনেক কাজও করেছি। শিক্ষকতার সময়েই আমি সহকারী প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি- সে কথা আগেই বলেছি।

আমার যতটুকু মনে পড়ে, প্রথমত আমি কখনও ইচ্ছা করে ক্লাসে দেরি করিনি। দ্বিতীয়ত আমি কখনও ছাত্রদের দিয়ে রাজনীতি করাইনি এবং নিজেও ছাত্রজীবনে কখনও রাজনীতির সাথে যুক্ত হইনি। আমি মনে করি, শিক্ষক যে হবে সে শুধু শিক্ষকতাটাকেই প্রাধান্য দেবে, কোনো রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারবে না। সেসময় অর্থনীতি এবং পদার্থবিজ্ঞান এই দুইটা বিভাগে কোনো রাজনীতি ছিল না। প্রক্টর থাকা অবস্থায় অনেক কিছুই আমার সাথে ঘটেছে, এমনকি রাজনৈতিক দলের দ্বারা আমার ওপর হামলাও হয়েছে।

উপ-উপাচার্য হিসেবে আমি দুই বছরের মতো কাজ করেছি। শিক্ষার্থীদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমি তা করার চেষ্টা করেছি।

যে শিক্ষকতা করতে আসবে তার নিজের ভেতর এটা থাকতে হবে যে, আমি শিক্ষক হব। মানে শুধু শিক্ষকই হব, অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা মনে আনা যাবে না। ছাত্রদের শেখানোর জন্য যা যা প্রয়োজন, যে নৈতিকতাটুকু প্রয়োজন সেটা তার ভেতর থাকতে হবে। নীতিবিবর্জিত শিক্ষকও ভালো না, শিক্ষার্থীও ভালো না। আর ছোট থেকে এই নৈতিকতার শিক্ষাটা যদি তার ভেতর থাকে তাহলে বড় হয়েও সে ভালো কাজই করবে। শিক্ষকতা করতে এসে পলিটিক্যাল নেতা হবার মনোভাব বর্জন করা একান্ত উচিত একজন শিক্ষকের জন্য।

প্রফেসর এম নজরুল ইসলাম

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫-এর শিক্ষক সম্মাননা প্রদানের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক আমাকে মনোনীত করায় আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমাকে এই সম্মাননা প্রদানের জন্য আমার অনেক ছাত্র, বন্ধু-বান্ধব উল্লাস প্রকাশ করে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ইমেরিটাস অরুণ কুমার বসাক স্বাস্থ্যগত কারণে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পেরে টেলিফোনের মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করেছেন। আমি সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলাম। আমার চাকরিকালীন যে প্রাপ্তি তা যথা সময়ে পেয়ে গেছি। সাফল্যের কথা চিন্তা করলে নজর ফিরাতে হয় আমার ছাত্রদের দিকে, তাদের জীবনের সাফল্যের দিকে। কর্মজীবনে তাদের কে কত ওপরে উঠল সেটা জেনেই শিক্ষকের অন্তরের প্রশান্তি। শিক্ষকতা যে মহান পেশা তা শৈশবে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পুত্রের গৃহশিক্ষকের উক্তি থেকেই অনুভব করেছিলাম। শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার, দিল্লীর পতি সে কোন সার...। কিন্তু বাস্তবে আমার জীবনে কী হতে চাই এমন নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণিতে 'আপনারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। ... বড় যদি হতে চাও ছোট হও ছোট তবে' ... কবিতা পড়িয়ে তারপর শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, কে কে বড় হতে চাও? সঙ্গীদের সবাই বলল তারা বড় হতে চায়। আমি চুপ থাকায় শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কী হতে চাস? আমি কী যেন ভেবে উত্তর দিলাম, ছোট হতে চাই। শিক্ষক বললেন - তোর মনটা এত ছোট রে! আমার উত্তরের পূর্ণ তাৎপর্য বোধগম্য হয় অনেক অনেক পরে যখন Steve Paul Jobs (Co-founder of Apple) কর্তৃক Stay Hungry Stay Foolish প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারিত হয়ে অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কতবার আমার জীবনের লক্ষ্য, My Aim in Life এই বিষয়ের ওপর নানান রকম রচনা লিখতে হয়েছে তার হিসেব নেই। প্রতিবারই আমার লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ক্লাসে বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতি লক্ষ করে আমার অতি প্রিয় একজন শিক্ষক জানতে চাইলেন- তুই ভবিষ্যতে কী হতে চাস? আমার উত্তর ছিল- বিএ পাশ করতে চাই। স্যার বললেন- তুই ভালো ছাত্র। তোর এমএ পাশ করা উচিত। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে আমার অজ পাড়াগাঁয়ের স্কুল পরিদর্শনে এলেন যশোহর রেঞ্জের স্কুল পরিদর্শক। তিনি নানান বিষয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন। উত্তর প্রদানে আমি তাঁর বিশেষ নজরে আসায় জানতে চাইলেন আমার জীবনের লক্ষ্য কী। আমার জবাব ছিল এমন- আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ অথচ এখানে কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি প্রাচীন। আমি একজন অভিজ্ঞ কৃষিবিদ হয়ে কৃষিকর্মে আধুনিকায়ন করে কৃষকদের শিক্ষিত করে দেশে কৃষিবিপ্লব আনতে চাই। রেঞ্জ ইন্সপেক্টর সাহেব বাহবা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করলেন- Yes! Such boys are wanted for the country. আমার এই লক্ষ্যের অগ্রগতি ঐ বাহবা প্রাপ্তিতেই পরিসমাপ্তি। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে প্রকৃত সমস্যায় উপণীত হলাম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পরে। উচ্চতর লেভেলে কী পড়া উচিত সে সম্পর্কে নানান প্রকার উপদেশ আসতে থাকল। পিতা-মাতার কোনো সাজেশন নেই। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ইচ্ছুক হলেও বাবার অমত। তাঁর মতে ধনী ও জমিদারদের সন্তানেরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আর ভবিষ্যতে দুর্নীতিবাজ হবার সম্ভাবনা থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আব্বাকে জানিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশে রওনা দিলাম। ফিজিক্স কী আব্বা জানতেন না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। এর পূর্বে ফিজিক্স পড়ার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগেনি তা নয়।

১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের লিডার খান আব্দুস সবুর কুষ্টিয়ায় রেনউইক মাঠে (Renwick Field, Kushtia) ভাষণ দিচ্ছিলেন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম কোণে অঙ্গুলি নির্দেশনা করে বললেন, ঐখানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট তৈরি হবে। সেখানে (সংখ্যা উল্লেখ করে) বিপুল সংখ্যক বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও নানান শ্রেণির মানুষের চাকরি হবে। তখন পরমাণু বিজ্ঞানী হবার ক্ষীণ আশা অন্তরে জেগেছিল।

মাস্টার্স পরীক্ষার শেষ প্রান্তে এসে থিসিসের ভাইভা-ভোসির আগের দিন বিকালে আমরা জন তিনেক সহপাঠী বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর আহমদ হোসেনের বাস ভবনে সাক্ষাৎ করে ভাঙ্গা মন নিয়ে বললাম- স্যার, আগামীকাল থেকে তো আমরা বেকার হয়ে যাচ্ছি। উনি বললেন- দেখ, আল্লাহ হয়তো একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

ভাইভার পরের দিন আন অফিসিয়াল আমন্ত্রণ আমাদের পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হলো। অনেক দিন যাবৎ বাবা-মার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, তাদেরকে পরীক্ষার ফলাফল জানতে হবে তাই গ্রামে যাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। পরের দিন সকালে বিভাগে যেতেই ড. সদরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী স্যারের সাথে দেখা। উনি বললেন আর সবাই কোথায়? তোমরা তাড়াতাড়ি বিভাগে লেকচারার হিসেবে জয়েন করো। এর সাড়ে ৫ মাস পরে এ কে এম আজহারুল ইসলামের বিবাহ অনুষ্ঠানে রাত্রে ভোজসভার মধ্যে প্রফেসর আহমদ হোসেন রেজিস্ট্রারের নিকট থেকে খবর পেয়ে সরাসরি এসে আমাকে জানালেন- আমিও ইংল্যান্ডে পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মেরিট স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়েছি। আজহারুল ইসলামের স্কলারশিপ প্রাপ্তির খবর কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এসে পৌঁছেছিল। এইভাবেই শিক্ষকতার পেশায় বন্দি হয়ে গেলাম।

আমার এত কিছু বলার উদ্দেশ্য নিজেকে গৌরবান্বিত করা নয় বরং আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে, জীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য স্থির করার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কোনো মানুষ সমাজের যে স্তর থেকেই আসুন না কেন, যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, সে যদি সর্বদা তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ট থাকে সাফল্য একদিন আসবেই ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

প্রফেসর মামনুনুল কেরামত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর মাঈন উদ্দীন। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. সালেহ্ হাসান নকীব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর মোহা: ফরিদ উদ্দীন খান।

সামনে উপবিষ্ট আছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ওমর আলী। আমি যখন সৈয়দ আমীর আলী হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন তিনি ওই হলের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন। আমি তাঁকে ছাত্র অবস্থায় পেয়েছিলাম। আমার সামনে আরও উপবিষ্ট আছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী শাহাজান আলী, আমজাদ হোসেন ও রফিকুল ইসলাম।

আমরা ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলাম। আমি এখানে উপস্থিত আছি, আর বাকি সাতজন বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছেন। আমি বেশি কিছু বলব না। আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি নিয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলব। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল, যা পরে আর কখনো তেমনভাবে দেখা যায়নি।

আমি টিনশেডের ছাত্র ছিলাম। পরে আমি মাদার বখ্শ হলে চলে যাই। এভাবে আমরা সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারিনি। সেখানে একটি টিনশেডের হল ছিল, যেখানে আমরা ক্লাস করেছি। আমরা সেই ঐতিহ্য কিছুটা ধরে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি।

আমার খুব কাছের মোস্তাফিজুর রহমান স্যার, এই সব মানুষের কথা আজ খুব মনে পড়ে। তাঁদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। সাইকোলজি বিভাগের নাজমুল হুদা স্যারসহ এমন অনেক গুণী শিক্ষক আমাদের জীবনের অংশ হয়ে আছেন।

সময় এগোবে, প্রযুক্তির উন্নতি হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা খুবই জরুরি। আমরা ছিলাম, আমরা যাচ্ছি– কিন্তু এই পুরো যাত্রাটাকে ধরে রাখার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। নতুন প্রজন্মের জানা উচিত, কী ছিল, কীভাবে শুরু হয়েছিল, যাত্রাটা কেমন ছিল। নইলে তারা এসে কখনোই জানতে পারবে না এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে গড়ে উঠেছে, কীভাবে পথচলা শুরু হয়েছিল।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো তার শিক্ষার্থীরা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরাই হলো সেই অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনের প্রাণশক্তি— the life of that academic institute। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। আর তাদের যে 'ব্রেন', যেটাকে আমরা হৃদয় বলি, সেটাই হলো শিক্ষক। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশনা দেবেন, পরিচালনা করবেন।

শিক্ষকদের কেন্দ্র করেই ছাত্রছাত্রীদের বেড়ে ওঠা। কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্ধু-বান্ধব, এরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের ভূমিকা ভিন্ন। একটি শরীর যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত, এগুলোও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। তবে মূল বিষয় হলো হার্ট হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, আর ব্রেন হচ্ছে শিক্ষকরা।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রায় ৪০ বছর আমাকে শিক্ষকতা করতে হয়েছে। দেখেছি, কোনো কোনো ছাত্র ভীষণভাবে ডিপ্রেশড হয়ে পড়ে। মনে করে, সে আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে। খবর পেয়ে আমি কাছে যেতাম "কী হয়েছে বাবা, তোমার? তোমাকে লড়তে হবে, আমরা আছি।" সে বলত, "স্যার, আমি মানুষ হতে পারব না।"

আমি কোনো অসৎ কথা বলতে চাই না, কিন্তু এমন সময় একজন শিক্ষকের পাশে দাঁড়ানো খুব প্রয়োজন। আমার অনুভূতি ছিল তাকে গাইড করা, সঠিক পরামর্শ দেওয়া। আমার মনে হয়, কোথাও না কোথাও একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের ট্রাস্ট তৈরি হতে হবে। তার কোথায় কী সমস্যা সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত উন্মুক্ত চিন্তার জায়গা। সবাই তার মতামত প্রকাশ করবে, আর সেটি গ্রহণ করতে হবে। তাকে বলার স্বাধীনতা দিতে হবে, আমাকে বলার স্বাধীনতা দিতে হবে। আমার কথা তাকে শুনতে হবে, তার কথা আমাকেও শুনতে হবে। এই জায়গাগুলোতে এখন অনেক সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি। কারণ আমি নিয়মিত সকাল-বিকাল এখানে আসি, সবকিছু খুব কাছ থেকে দেখি।

সবশেষে বলতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয় ভালো থাকুক, এই দেশ ভালো থাকুক, সমাজ ভালো থাকুক। সহনশীলতা তৈরি হোক। একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা, এই মূল্যবোধগুলো সমাজে গড়ে উঠুক। এই কামনাই করি।

রচনাসমূহ

রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় : প্রথম স্থান

টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

মো. শাহিন বাদশা সুমন
ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ শহীদ হবিবুর রহমান হল

ভূমিকা

সমাজ হলো মানুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রার প্রতিফলন। মানুষ একা নয়; বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে ওঠে। মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে আজকের পৃথিবী নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ও পরিবেশ দূষণ আমাদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন টেকসই সমাজ গঠন, যেখানে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি না করে। টেকসই সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। কারণ শিক্ষা মানুষকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। আর এই শিক্ষার প্রধান কারিগর হলেন শিক্ষক। শিক্ষক কেবল পাঠ্যবই শেখান না; বরং জীবনবোধ, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সৃজনশীলতার জ্বালানি যোগান দেন। তাই বলা যায়, টেকসই সমাজ গঠনের প্রকৃত স্থপতি শিক্ষক।

টেকসই সমাজের ধারণা

টেকসই সমাজ বলতে এমন এক সামাজিক কাঠামোকে বোঝায়, যেখানে–

- প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয়
- পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনা হয়
- সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও শান্তি বজায় থাকে
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে পরিবেশের ক্ষতি না করেই
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনমান অক্ষুণ্ন রাখা হয়

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) এ বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সামাজিক সমতা–সব ক্ষেত্রেই টেকসই সমাজের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। আর এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকই হচ্ছেন সর্বাগ্রে ভূমিকা পালনকারী।

শিক্ষকের ভূমিকাসমূহ

নোবেল বিজয়ী বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষকদের সভ্যতার অভিভাবক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শিক্ষক তিন অক্ষরের একটি বিশিষ্ট শব্দ–

'শি' মানে শিষ্টাচার,

'ক্ষ' মানে ক্ষমাশীল,
'ক' মানে কর্তব্যপরায়ণ।

একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহুবিধ কাজ সম্পাদন করেন। তিনি সুযোগ প্রদানকারী, সমস্যার সমাধানকারী, পরিকল্পনাকারী, গবেষক, পরীক্ষা-নিরীক্ষক, পর্যবেক্ষক, মূল্যায়নকারী, নেতৃত্বদানকারী, পরামর্শদাতা। তিনি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক, ভালো বক্তা, ভালো শ্রোতা, যুক্তিবাদী, অনুভূতিশীল, মনোসংযোগকারী, আজীবন ছাত্র, আত্মসমালোচক, ন্যায়নিষ্ঠাবান ও পাঠ পরিবেশনকারী।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক সম্পর্কে বলেছেন– 'কৌতূহল জাগানো ও কৌতূহল নিবারণ করা শিক্ষকের কাজ।' শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেন। সাহস জুগিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার দীক্ষাও দিয়ে থাকেন।

এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের -

(ক) সচেতনতা সৃষ্টি :

শিক্ষক হলেন সমাজের সচেতনতার আলোকবর্তিকা। তিনি শিক্ষার্থীদের শেখান–

- পরিবেশের গুরুত্ব
- গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা
- পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়
- বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও পরিচ্ছন্নতা

একজন সচেতন শিক্ষার্থী তার পরিবারে পরিবর্তন আনে; পরিবার থেকে পরিবর্তন ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। এভাবেই ধীরে ধীরে গোটা সমাজ টেকসই পথে অগ্রসর হয়।

(খ) নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা

নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য শুধু প্রযুক্তি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নৈতিক মানুষ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখান–

- সততা
- দায়িত্ববোধ
- সহযোগিতা
- সহমর্মিতা
- শৃঙ্খলা
- ন্যায়পরায়ণতা

নৈতিক শিক্ষার অভাবে সমাজ ভোগবাদী হয়ে পড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে ধ্বংস ডেকে আনে। তাই শিক্ষকই টেকসই সমাজের নৈতিক ভিত গড়ে দেন।

(গ) উদ্ভাবন ও গবেষণায় উদ্‌বুদ্ধকরণ

টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবন অপরিহার্য। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন, প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেন এবং নতুন কিছু উদ্ভাবনের পথে পরিচালিত করেন।
যেমন–

- কৃষিতে টেকসই উৎপাদন
- পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ব্যবহার

- বিজ্ঞান মেলা ও প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা
- সমস্যা সমাধানভিত্তিক ক্লাস

এসব শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটক

শিক্ষক কেবল বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেন না; বরং সমাজে–

- স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচার
- পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের সহায়তা

এর মাধ্যমে তিনি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেন।

(ঙ) গণতান্ত্রিক চেতনা ও নেতৃত্ব বিকাশ

একটি টেকসই সমাজ কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে না; সেখানে গণতন্ত্র, অধিকার ও সমতা থাকতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখান–

- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- অন্যের মতকে সম্মান করা
- দায়িত্বশীল নেতৃত্ব
- গণতান্ত্রিক আচরণ

এর ফলে তারা দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে সমাজ পরিচালনায় অবদান রাখে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। ছাত্রসংসদ নির্বাচন, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে নেতৃত্ব শেখানো হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

- জাতীয় পর্যায়ে টেকসই শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়নে শিক্ষক ভূমিকা রাখেন।
- গবেষণা, নীতি প্রস্তাবনা ও জনমত গঠনে শিক্ষক প্রভাব ফেলতে পারেন।
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন, অনলাইন প্ল্যাটফরম ও শিক্ষক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় হয়।

শিক্ষকের সীমাবদ্ধতা ও করণীয়

যদিও শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম, তবুও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন–

- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব
- শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি
- আর্থিক সংকট
- সামাজিক মূল্যায়নের অভাব

এসব সমস্যার সমাধান করলে শিক্ষকরা আরও কার্যকরভাবে টেকসই সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারবেন।

উপসংহার

শিক্ষক হলেন সমাজের দিশারী। তাঁর হাতে গড়ে ওঠে আগামী দিনের নাগরিক, যারা পরিবেশবান্ধব, নৈতিক ও দায়িত্বশীল। টেকসই সমাজ গঠনের প্রতিটি স্তম্ভ–সচেতনতা, নৈতিকতা, প্রযুক্তি, নেতৃত্ব ও মানবিকতা– সবকিছুর মূলেই শিক্ষক। তাই বলা যায়, টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম, অপরিবর্তনীয় ও অমূল্য। শিক্ষক ছাড়া টেকসই সমাজ কেবল কল্পনা, বাস্তবতা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় : দ্বিতীয় স্থান

টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

জারিন তাসনীম

ইতিহাস বিভাগ রহমতুন্নেসা হল

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার ও সভ্যতার আলোকবর্তিকা। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ উপলব্ধি করেছে-শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়; এটি মানুষকে দায়িত্বশীল, নৈতিক, সহমর্মী ও মানবিক করে তোলে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন যদি পরিবেশের ক্ষতি করে, যদি তা সমাজের বৈষম্য বাড়ায়, অথবা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্পদ ফুরিয়ে যায়-তাহলে সে উন্নয়ন কোনো সুফল বয়ে আনে না। এ জন্য জাতিসংঘ ২০১৫ সালে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (Sustainable Development Goals বা SDG) ঘোষণা করেছে, যেখানে শিক্ষা, পরিবেশ, দারিদ্র্য বিমোচন, সমতা ও শান্তি সবকিছুকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষকই সেই আলোকিত মানুষ, যিনি জ্ঞানের সাথে নৈতিকতা, পরিবেশ সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ শিক্ষাবোধ মনে প্রোথিত করেন। তাই টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এ দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Empowering Educators: Strengthening Resilience, Building Sustainability' বাংলায় যার অর্থ, 'শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন: স্থিতিস্থাপকতা জোরদারকরণ, টেকসই উন্নয়ন নির্মাণ।' এই প্রতিপাদ্যের ভাবনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, একটি টেকসই সমাজ গড়তে হলে শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে রাখতে হবে, তাঁদের মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই সমাজের সংজ্ঞা

'টেকসই সমাজ' বলতে এমন এক সামাজিক কাঠামোকে বোঝায়, যা দীর্ঘমেয়াদি মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। যেখানে সামাজিক সাম্য, পরিবেশের ভারসাম্য, নৈতিকতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক চর্চা বজায় থাকে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের মাধ্যমে পৃথিবীকে একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা সবচেয়ে বড়।

টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

১. জ্ঞান ও মূল্যবোধের বিকাশ

একটি সমাজ তখনই টেকসই হই যখন তার মানুষগুলো শিক্ষিত, দক্ষ ও সচেতন হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে শুধু পাঠ্যবই শেখান না, বরং তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মানবিকতা, পরোপকারিতা ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেন। বাংলাদেশে বারবার দেখা গেছে, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদেরকে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে যুক্ত করেছেন- যেমন বৃক্ষরোপণ, বন্যাদুর্গতদের সাহায্য কিংবা দারিদ্র্য বিমোচনমূলক উদ্যোগ। এসব উদ্যোগ কেবল জ্ঞান অর্জন নয়, বরং মূল্যবোধ বিকাশে সাহায্য করে।

উদাহরণ: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন- 'শিক্ষা কেবল জ্ঞান দেয় না। এটি নৈতিক চরিত্রও গড়ে তোলে।' বাংলাদেশে ও দেখা গেছে, অনেক শিক্ষক গ্রামে গিয়ে শুধু পড়াশোনা করাননি বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শিখিয়েছেন।

২. পরিবেশ সচেতনতা তৈরি

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংকট আজ বৈশ্বিক সমস্যা। বাংলাদেশ একটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকরা যদি শ্রেণিকক্ষে পরিবেশবান্ধব আচরণের শিক্ষা দেন- যেমন: প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, বর্জ্য আলাদা করা, বৃক্ষরোপণ-তাহলে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতা তৈরি হবে।

উদাহরণ: বাংলাদেশে অনেক স্কুলে 'পরিবেশ ক্লাব' চালু আছে, যেখানে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ রক্ষার ছোট ছোট উদ্যোগ নেয়। এই ধরণের কার্যক্রম ভবিষ্যতে একটি পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি

২১ শতক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। টেকসই সমাজের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। শিক্ষকরা আধুনিক শিক্ষা, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তুলেন। বাংলাদেশ এখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের পথে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, সৃজনশীলতা চর্চা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলেন। পাশাপাশি তিনি আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন।

UNESCO-এর এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতি ১% দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশের জিডিপি গড়ে ০.৫% বৃদ্ধি পায়। এখানেই বোঝা যায়, শিক্ষক কতটা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়নে।

৪. ভবিষ্যত নেতৃত্ব গড়ে তোলা

আজকের শিক্ষার্থীই আগামী দিনের নেতা। শিক্ষকই তৈরি করেন ভবিষ্যতের নেতা। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়। একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলগত কাজ, আলোচনাচক্র বা বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের সুযোগ দেন। এতে তারা কেবল পড়ালেখায় নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া, অন্যকে পরিচালনা করা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করে।

উদাহরণ: ভারতের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর শৈশবে শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা পেয়েছিলেন যা তাঁকে 'জনতার প্রেসিডেন্ট' হতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনেক শিক্ষক বিতর্ক ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব কিংবা স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ তৈরি করেছেন।
এইসব শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

৫. শান্তি ও সহনশীলতার শিক্ষা

টেকসই সমাজ গড়ে তুলতে শান্তি, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের বিকল্প নেই। সহিংসতা, বৈষম্য ও বিদ্বেষ সমাজকে দুর্বল করে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দেন।

উদাহরণ: UNESCO-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় 'শান্তি শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত, সেসব দেশে নাগরিক সংঘর্ষের হার গড়ে ৩০% কম। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, শিক্ষকরা সরাসরি শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন।

৬. সামাজিক ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তি

একটি সমাজ তখনই টেকসই হয়, যখন সেখানে বৈষম্য কমে ও সবাই সমান সুযোগ পায়। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গ, ধর্ম বা আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের সমানভাবে শিক্ষা দেন।

উদাহরণ: ২০২২ সালের 'সেরা শিক্ষক পুরস্কার' পাওয়া নড়াইলের এক শিক্ষিকা দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখার জন্য নিজে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন। ফলে অনেক মেয়ে শিক্ষার আলো পেয়েছে ও সমাজে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

৭. বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন

আজকের পৃথিবী আর সীমান্তে বাঁধা নেই; প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র পৃথিবী আজ একক সমাজে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য, অভিবাসন সমস্যা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বৈশ্বিক ইস্যু মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানসিকতা গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে তৈরি করেন, যাতে তারা দেশ ও জাতি ছাড়িয়ে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে কাজ করতে পারে।

উদাহরণ: পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া মালালা ইউসুফজাইকে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষকরা পড়াশোনার প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন ও বিশ্বমানব হিসেবে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন। তারা শুধু স্কুলের পাঠ্যবই শেখাননি, বরং তাকে

শিখিয়েছিলেন যে, শিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র নিজের দেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। শিক্ষকের এই দিকনির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণার কারণে মালালা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মহলে নারীর শিক্ষার অধিকার নিয়ে কার্যকর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং একটি বৈশ্বিক প্রভাব তৈরি করেছেন।

৮. গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান

একটি জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে তার গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের উপর। শুধু পাঠ্যবই পড়ে মুখস্থ বিদ্যা অর্জন করলে সমাজে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। নতুন চিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃজনশীল উদ্ভাবনের চর্চাই দেশের উন্নতির মূল চাবিকাঠি। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

উদাহরণ: স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে ছোটবেলায় অনেকেই তার গবেষণার কাজে ব্যর্থ হবে বলে ভয় দেখাত।
কিন্তু তার শিক্ষক তাকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছিলেন, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রেরণা দিয়েছেন। ফলে তিনি উদ্ভিদে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হন ও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: SDGs ও শিক্ষকের ভূমিকা

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য হলো সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নির্দেশ করা (SDG4)। এর পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন (SDG1), ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী (SDG2), জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা (SDG13) ইত্যাদিও শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষক SDG বাস্তবায়নে মূল চালিকাশক্তি। তিনি শিক্ষার্থীদের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে।

উন্নত দেশগুলোতে যেমন পরিবেশবাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তেমনি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ও শিক্ষকই এই পরিবর্তনের প্রধান নায়ক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে দারিদ্র, শিক্ষার বৈষম্য, বেকারত্ব, পরিবেশ দূষণ বড় সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে শিক্ষক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা গ্রামে গ্রামে শিশুদের স্কুলে আনতে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারী শিক্ষা প্রসারে কাজ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গবেষণা, উদ্ভাবন ও সমাজ উন্নয়নের নতুন পথ খুঁজে দেন। তাই বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিহার্য।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষকই সেই আলোর দিশারি যিনি অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে সমাজকে আলোকিত করেন। তিনি কেবল একজন পাঠদাতা নন; তিনি হলেন দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, নৈতিকতার শিক্ষক ও সমাজের নেতা। টেকসই সমাজ গড়তে যেমন প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ, তেমনি প্রয়োজন মানবিকতা, ন্যায়বোধ ও পরিবেশ সচেতনতা-আর এইসব গুণের সমন্বয় ঘটান শিক্ষক। অর্থাৎ শিক্ষকই হচ্ছেন টেকসই সমাজ গঠনের স্থপতি। তিনি সেই প্রদীপ, যার আলো নিভে গেলে সমাজ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয, আর জ্বলতে থাকলে গোটা জাতি আলোকিত হয়। একটি টেকসই সমাজ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষকের হাত শক্তিশালী করা, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা ও তাঁর জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় : তৃতীয় স্থান

টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

কাজী এস এম আবদুল্লাহ

মার্কেটিং বিভাগ শেরে বাংলা ফজলুল হক হল

ভূমিকা

সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের উন্নতি নির্ভর করে মানুষের মানসিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর। একটি সমাজ তখনই টেকসই হয় যখন তার নাগরিকরা কেবল জ্ঞানীই নয়, বরং নৈতিক, দায়িত্ববান, সহমর্মী এবং সচেতন হয়ে ওঠে। সেই উন্নয়নের মূল স্তম্ভ শিক্ষকের হাত ধরেই গড়ে ওঠে। শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান বিতরণকারী নয়; তিনি একজন আদর্শ, পথপ্রদর্শক ও অলোর দিশারী। সমাজের প্রতিটি কণিকায় শিক্ষকের প্রভাব বিস্তৃত থাকে, যেমন সূর্যের আলো ছায়াকে তাড়ায়, তেমনি সমাজে শিক্ষকের প্রভাবও অন্ধকার দূর করে আলো ছড়িয়ে দেয়। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়

'শিক্ষক সেই বাতাস, যা অন্ধকারকে আলোর পথে নিয়ে যায়।' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞান বিতরণে শিক্ষকের অবদান

শিক্ষক হলো জ্ঞানের আলোর প্রদীপ। একটি শিশুর মনে যতটা আলো পৌঁছায়, তার মানসিক বিকাশও ততটা প্রস্ফুটিত হয়। শিক্ষক শুধুমাত্র বইয়ের পাতা উলটে পড়ায় না বরং চিন্তা-চেতনাকে প্রসারিত করার পন্থা দেখান। তিনি শিক্ষার্থীদের কল্পনা, বিবেক ও জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করেন, তাদের প্রশ্ন করতে শেখান এবং সমাধানের পথ দেখান।

শিক্ষার লক্ষ্য হলো জীবনকে প্রস্তুত করা, পরীক্ষার জন্য নয়।' – আলবার্ট আইনস্টাইন

শিক্ষকের আছে সমাজের ভবিষ্যৎ গঠন করার ক্ষমতা। যখন তিনি শিক্ষার্থীদের গণিতের সূত্র, বিজ্ঞান বা ইতিহাসের ঘটনা শেখান, তখন তিনি শুধু তথ্য দেন না, বরং বিশ্লেষণ, সমস্যার সমাধান এবং যুক্তি বিকাশের উপায় দেখান। জ্ঞান ছাড়া মানব জীবনের দিগন্ত অন্ধকারচ্ছন্ন। শিক্ষক সেই অন্ধকার দূর করে আলোর প্রদীপ জ্বালান, যা শিক্ষার্থীর মনের ভিতরে আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকের ভূমিকা শুধু জ্ঞান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রচারক। মানবজীবন কেবল জ্ঞান দিয়েই পূর্ণ হয় না; নৈতিকতা ও মূল্যবোধ হলো সেই শক্তি যা সমাজকে স্থিতিশীল রাখে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা, ধৈয, পরিশ্রম, সততা এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেন।

'শিক্ষা শুধু মাথায় নয়, হৃদয়ে লাগুক।' – মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষক একটি জীবন্ত আদর্শ। তার আচরণ শিক্ষার্থীদের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। যে শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের শৃঙ্খলা, সততা, এবং মানবিক মূল্যবোধ দেখে বড় হয়, সে শিক্ষার্থী সেই গুণগুলো সমাজে বহন করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে সত্য ও ন্যায়ের স্বপ্ন বুনে দেন, যা সমাজকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তুলে।

পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ব শেখানো

একজন শিক্ষক সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক গঠনের জন্য পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়বোধের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি শুধু শিখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না যে যে বৃক্ষরোপণ করতে হবে, পানি অপচয় করা যাবে না, বা প্লাস্টিক দূষণ কমাতে হবে, বরং তিনি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝান, কীভাবে পরিবেশের রক্ষা করার মাধম্যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ পূরণ করতে হয়।

পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।' – ডেভিড অ্যাটেনবারো

শিক্ষক মনের মধ্যে সমাজের দায়িত্ববোধের বীজ বপন করে। সমাজে অন্যের কষ্ট বোঝার ক্ষমতা, দরিদ্র ও অসহায়কে সাহায্যের মানসিকতা, এবং সামাজিক ন্যায় ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা–এইসব শিক্ষার মূল দিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে অনুধাবন করান। শিক্ষার্থীরা যখন এই শিক্ষাগুলোকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে, তখনই সমাজে একটি সমন্বিত ও টেকসই পরিবেশ গড়ে ওঠে।

সুশাসন, মানবিকতা ও সমতায় উৎসাহ দেওয়া

টেকসই সমাজ গঠনে সমতা, মানবিকতা, এবং সুশাসনের ধারণার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখান শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং সমাজের কল্যাণের জন্যও কাজ করতে হবে। তিনি তাদের সমতা, ন্যায়, ও মানবিকতার মূল্যবোধে শিক্ষিত করে তোলেন।

'ন্যায় হলো সমাজের মূল ভিত্তি।' – প্লেটো

একজন শিক্ষক বইয়ের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবিক আচরণ, ক্ষমা এবং সহানুভূতির চর্চার শিক্ষা দিয়ে থাকেন । তিনি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন, যেন তারা সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের সাথে সমান আচরণ করে। সুশাসন শেখানো মানে যে শুধুই সরকারের নিয়ম-কানুন শেখানো তা কিন্তু নয়; আরো শেখায় যে কীভাবে সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্বে জীবন গড়তে হয়।

শিক্ষক সমাজের সেই বাতিঘর, যার আলোয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনের আঁধার দূর হয়। তিনি কেবল জ্ঞান বিতরণকারী নন, বরং মানবিকতা, নৈতিকতা, সমতা এবং দায়িত্ববোধর শিক্ষা প্রদান করে সমাজকে টেকসই করার লক্ষে কাজ করেন। একজন শিক্ষক যেভাবে শিক্ষার্থীদের জীবনকে আলোকিত করেন, সেভাবে সমাজকেও আলোকিত করে, দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিকদের দ্বারা পূর্ণ করেন। শিক্ষকই একটি সমাজকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করার মূল কারিগর।

নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা

শিক্ষক কেবল অনুসারী তৈরি করেন না, তিনি ভবিষ্যতের নেতাদের উদ্ভাবনী চিন্তা, দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সৃজনশীল নেতৃত্ব বিকাশে উৎসাহিত করেন। শিক্ষক ছাত্রদেরকে দল পরিচালনা করা, সমস্যা সমাধান ও কার্যকর যোগাযোগ এবং দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের দক্ষতায় প্রস্তুত করে গড়ে তোলে। তিনি শিক্ষার্থীদের শেখান, কীভাবে নতুন ধারণা প্রবর্তন করা যায়, কীভাবে জটিল পরিস্থিতিতেও স্থির মনোভাব বজায় রাখাতে হয় এবং কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় শিক্ষার্থীরা শুধু নিজের জন্যে নয়, সমাজের জন্যেও দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

'একজন সৎ নেতা হলো সে, যিনি অন্যকে এগিয়ে নিতে শেখান।' নেলসন ম্যান্ডেলা

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা বিকাশ

'সৃজনশীলতা হলো জ্ঞানকে জীবন্ত করার উপায়।' – পিকাসো

শিক্ষক কেবল জ্ঞান ও তথ্য প্রদানকারী নয়, বরং উদ্ভাবনী চিন্তা ও সৃজনশীলতার মূল চালক। তারা শিক্ষার্থীদেরও সমালোচনামূলক ভাবনা, কল্পনা শক্তি এবং নতুন ধারণা গঠনের সুযোগ করে দেন। বিভিন্ন প্রকল্প, গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড এবং আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু তৈরির জন্য আগ্রহী হয়। শিক্ষক তাদের মধ্যে সাহস, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং বিশ্লেষণাত্মক ভাবধারা তৈরি করেন। এই সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনী মনোভাবই ভবিষ্যতের টেকসই সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ

একটি সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সংস্কৃতি হলো মানুষের আত্মার ভাষা, আর ঐতিহ্য হলো তার জীবনের ধারাবাহিকতার চিহ্ন। শিক্ষকদের হাতে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব নেমে আসে। শিক্ষক পাঠ্যবই

পড়ানোর পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীর মনকে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তিনি গল্প, কবিতা, নৃত্য, গান, প্রথা এবং ইতিহাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে ঐতিহ্যকে গভীরে পৌঁছে দেন।

'সংস্কৃতি হলো একটি জাতির আত্মা।' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষকরা দেখান, কীভাবে অতীত প্রজন্মের জীবনদর্শন ও সংস্কৃতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক ও মানসিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। তিনি শিক্ষার্থীদের শেখান কীভাবে ঐতিহ্যকে ধারণ করে আধুনিক জীবনের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা যখন তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করে, তখন তারা শুধুই নিজের পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে না, বরং সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষক এই সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মপরিচয়কে দৃঢ় ও সুগঠিত করে, যা টেকসই সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষক ও প্রযুক্তির ব্যবহার

সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার ধরণা পরিবর্তিত হচ্ছে। আজকের আধুনিক যুগে শিক্ষক শুধু পাঠদানকারী নয়, বরং প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান প্রসারে অবদান রাখছেন। ডিজিটাল শিক্ষা শিক্ষার্থীকে দ্রুত, কার্যকর এবং বৈচিত্র্যময় শিক্ষার অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিচ্ছে। শিক্ষক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠ্যক্রমকে প্রাণবন্ত করেন, শিক্ষার্থীদের কল্পনা ও অনুসন্ধানী মনকে জাগ্রত করেন।

'প্রযুক্তি শিক্ষাকে সীমাহীন করে দেয়।' – বিল গেটস

ডিজিটাল প্ল্যাটফরম যেমন অনলাইন লেকচার, ই-লার্নিং অ্যাপলিক্যাশন, ভার্চুয়াল ল্যাব, এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে বাড়িয়ে দেয়। শিক্ষক পথ দেখান কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জ্ঞান অহরণ করতে হয় এবং কীভাবে শিক্ষার্থী নিজের মতো করে বিশ্লেষণ ও সমাধান করতে পারে। তবে শিক্ষক সর্বদা সতর্ক থাকেন, যেন প্রযুক্তি শুধুমাত্র মাধ্যম হয়, একমাত্র উপায় নয়। তিনি শিক্ষার্থীর নৈতিকতা, মানবিকতা এবং সমান সুযোগের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করেন। এর ফলে শিক্ষার্থী প্রযুক্তিতে দক্ষ হয় এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

মানবিক ও সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ

শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক ও সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। মানুষ কেবল জ্ঞানী হলেই যথেষ্ট নয়; তাকে সকলের প্রতি সহমর্মী, সহানুভূতিশীল ও মানবিক হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মনে অন্যের কষ্ট বোঝার ক্ষমতা, সহানুভূতি, সাহায্যের মানসিকতা এবং ধৈর্যবোধের মনোভাব বিকাশ করেন।

'সহমর্মিতা হলো মানবতার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।' – দালাই লামা

শিক্ষক উদাহরণ হিসেবে দেখান কীভাবে মানবিকতা ও সহমর্মিতা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। তিনি শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে সমতা, ন্যায়বিচার এবং মানবিক দায়িত্বের বীজ বপন করেন। শিক্ষার্থী যখন এই শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করে, সমাজে সহমর্মী, দায়িত্ববান এবং মানবিক নাগরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষক এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের মানসিক ও নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করেন, যা টেকসই সমাজ গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

সামাজিক সমস্যা সচেতনতা ও সমাধান

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান দেন না, তিনি তাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কেও সচেতন করেন। তিনি দেখান কিভাবে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলো সমাজকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মঝে সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষমতা এবং সমাধানের চিন্তাভাবনা বিকাশ করেন।

'সমাজ পরিবর্তনের শক্তি হলো শিক্ষার মধ্যে।' – এপিক্টেটাস

শিক্ষক সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের পন্থা দেখান। তিনি শিক্ষার্থীরকে উৎসাহিত করেন সমাজসেবায়, কমিউনিটি প্রকল্পে অংশ নিতে এবং ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়বোধে বিশ্বাস রাখতে। শিক্ষার্থী যখন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে

যায় তখনই সমাজে উদ্ভাবনী ও কার্যকর পরিবর্তন আসে। শিক্ষকগণ এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব ও সমাধানধর্মী চিন্তাধারা বিকাশে সহায়তা করেন, যা টেকসই ও সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে শিক্ষকের ভূমিকা

২০২৪ সালের জুলাইয়ের ছাত্রজনতার আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় শিক্ষকের ভূমিকা ছিল অভাবনীয়। শিক্ষকগণ কেবল শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেননি, বরং শান্তিপূর্ণ ও নৈতিকভাবে প্রতিবাদ করার পথ দেখিয়েছেন, আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে শিক্ষার্থীদের যুক্তি ও বিশ্লেষণশীল চিন্তাকে উৎসাহিত করেছেন।

শিক্ষকগণ এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে সৈরাচারের পতনের মাধ্যমে দেশের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। সামাজিক পরিবর্তন। শিক্ষকগণ আন্দোলনের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানানোর মাধ্যমে দায়িত্ববোধ ও নৈতিক আচরণের গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষকরাই আন্দোলনে শিক্ষার্থীর মানসিক স্থিতি ও উদ্যমকে ধরে রেখেছিলেন। এইভাবে শিক্ষকগণ সমাজের পরিবর্তনের যুগে যুগে অগ্রদূত হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করিয়েছেন।

উপসংহার

টেকসই সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা এক অমূল্য রত্নের মতো। শিক্ষকগণ কেবল জ্ঞান দানকারী নন, বরং সমাজের মানবিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের পেছনে নিরলসভাবে কাজ করে থকেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের ভিতরে মূল্যবোধ, সহমর্মিতা, সমতা এবং সামাজিক দায়বোধের বীজ বপন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদেরকে তিনি সমাজের সচেতন, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেন। শিক্ষকের শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরকে আলোকিত করে, যা সমাজকে স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ এবং টেকসই করে তোলে। প্রতিটি শিক্ষকের ভূমিকা এমন এক সমাজ গঠন করে, যেখানে জ্ঞান, মানবিকতা, নৈতিকতা, এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একসাথে বেড়ে ওঠে। শিক্ষকের হাত ধরেই গড়ে ওঠে সেই সমাজ, যা আগামী প্রজন্মের জন্য এক শক্তিশালী এবং আলোয় ভরা পৃথিবী উপহার দেয়।

‘শিক্ষক হলো সমাজের আর্দ্র মাটিতে বীজ বপনকারী, যিনি ভবিষ্যতের আলো জ্বালান।’ – হেলেন কেলার

রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান: স্কুল পর্যায় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি)

স্কুল পর্যায় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি): প্রথম স্থান

আমার প্রিয় শিক্ষক

আহনাফ তাওসীফ খান

১০ম শ্রেণি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল

ভূমিকা

শিক্ষক হলেন মানব সমাজের আলোকবর্তিকা। শিক্ষক ছাড়া কোনো মানুষ প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে পারে না। একজন শিক্ষক শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই দেন না, তিনি শিক্ষার্থীদের সৎ-সাহসী, আদর্শবান ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবেও গড়ে তোলেন। প্রতি বছর ৫ অক্টোবর সারা বিশ্বে ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ পালিত হয়। এই দিনে আমরা আমাদের

শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আজকের আলোচ্য বিষয় 'আমার প্রিয় শিক্ষক'। আমার জীবনে অনেক শিক্ষক আছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি হলেন আমাদের বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক মো. বাদশা আলম।

আমার প্রিয় শিক্ষক পরিচিতি

বাদশা আলম স্যার আমাদের বিদ্যালয়ের একজন গুণী, মমতাময় ও প্রেরণাদায়ী শিক্ষক। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলা বিষয়টি পড়ান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কতটা সমৃদ্ধ ও মধুর, তা আমরা তাঁর কাছ থেকেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে অনুভব করি। তাঁর ক্লাস মানেই আনন্দ ও জ্ঞানের মিলনমেলা।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য

স্যারের পড়ানোর ধরন আলাদা। তিনি কখনোই শুধু বই মুখস্থ করতে বলেন না। বরং বাস্তব জীবনের গল্প, কবিতার আবৃত্তি বা মজার উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলো সহজ করে বোঝান। কঠিন ব্যাকরণও তিনি এমনভাবে শেখান যে মনে হয় খুব সহজ। তিনি বলেন, 'ভালোভাবে বোঝা, মুখস্থ আপনা-আপনি হয়ে যাবে।' তাঁর এই শিক্ষাদান পদ্ধতির কারণে বাংলা বিষয়টি আমাদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শুধু পড়াশোনাই নয়, তিনি আমাদের জীবন গঠনের শিক্ষা দেন। সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সততা, পরিশ্রমের গুরুত্ব তিনি আমাদের মনে গভীরভাবে গেঁথে দিয়েছেন। তিনি সবসময় বলেন- 'সত্যিকারের মানুষ হও, তাহলেই সাফল্য আপনা-আপনি আসবে।' তাঁর কথাগুলো আমার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে গিয়েছে।

ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলি

বাদশা আলম স্যার অত্যন্ত সৎ, নম্র ও আন্তরিক একজন মানুষ। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন। তিনি সেই সমস্যা সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি কখনো রাগান্বিত হলেও আমাদের প্রতি তাঁর মমতা লুকানো থাকে না। তাই আমরা সবাই তাঁকে খুব সম্মান করি এবং ভালোবাসি।

বিদ্যালয়ে তাঁর অবদান

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর থেকে পাওয়া শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এখন পর্যন্ত অনেক শিক্ষার্থী সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তাঁর অবদান অপরিসীম। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা বা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা- সবকিছুতেই তিনি আমাদের উৎসাহিত করেন এবং অংশগ্রহণ করান। তাঁর দিকনির্দেশনায় আমাদের বিদ্যালয় বারবার সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য যা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন তার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

আমার জীবনে তাঁর প্রভাব

আমার জীবনে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। আগে আমি বাংলা বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু স্যারের কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার ভীষণ ভালোবাসা জন্মেছে। এখন আমি নিয়মিত কবিতা পড়ি, প্রবন্ধ লিখি, এমনকি রচনা প্রতিযোগিতায়ও অংশ নেই। স্যারের অনুপ্রেরণাতেই আজ আমি কলম হাতে বসতে শিখেছি। তিনি শুধু আমার নয়, আমাদের সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় শিক্ষক। তিনি আমাদের চোখে সত্যিকারের নায়ক। সমাজকে আলোকিত করার যে মহৎ কাজ তিনি করছেন, তা কোনো সম্পদ দিয়েও পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

শিক্ষাঙ্গনের বাইরে স্যার

শিক্ষাঙ্গনের বাইরে গেলেও স্যারের গুণাবলিতে কোনোরূপ পরিবর্তন আসে না। তিনি সকলের সাথে বিনয়ী, বন্ধুসুলভ এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করেন। গুরুজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকলের সঙ্গে আগে সালাম বিনিময় করেন, এতে করে সে ব্যক্তিও সালাম দেওয়ার শিক্ষা অর্জন করে। স্যারের গুণাবলিসমূহের প্রতি মুগ্ধ হয়ে স্যারকে অনুসরণ করে তার নানা গুণাবলি আয়ত্ব করে। শিক্ষার্থীরা ছুটির সময় স্যারের খোঁজ নিতে ভুলে গেলেও

স্যার কখনোই তা ভোলেন না। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকলে বা কোনো শিক্ষার্থী স্কুলে না এলে অতি দ্রুত তার খোঁজ-খবর নেন। তাঁর এসকল গুণাবলি আমাকে সবসময়ই মুগ্ধ করে।

প্রিয় শিক্ষককে কেন্দ্র করে কিছু অভিজ্ঞতা

প্রিয় শিক্ষককে কেন্দ্র করে আমার জীবনে এমন কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে যা আমাকে জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলোতে সহায়তা করেছে। এমন দুটো অভিজ্ঞতা হলো:

(ক) একবার ক্লাসে কঠিন একটি ব্যাকরণ বিষয় আমি ভুল করেছিলাম। এই কারণে নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলাম। পরবর্তীকালে স্যার ধৈর্যের সঙ্গে ধাপে-ধাপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

(খ) গতবছর অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় প্রস্তুতি খারাপ থাকার কারণে আমি কিছুটা বাজে ফলাফল করি। এতে আমি প্রচুর ভেঙ্গে পড়ি। এই কঠিন মুহূর্তে স্যার আমার পাশে দাঁড়ান। আমাকে ধৈর্য ধরে পরিশ্রম চালিয়ে যেতে বলেন এবং কঠিন বিষয়গুলো সহজভাবে নানা উদাহরণের সাথে আমাকে বুঝিয়ে দেন। তাঁর এই সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় আমি পরবর্তীকালে অত্যন্ত ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হই এবং তিনিও আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন।

উপসংহার

সব শিক্ষকই সম্মানের যোগ্য, কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে একজন প্রিয় শিক্ষক থাকেন যিনি তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন। আমার জীবনে সেই মানুষটি হলেন মো. বাদশা আলম স্যার। তিনি শুধু একজন শিক্ষক নন, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, প্রেরণার উৎস ও জীবনের পথচলার আলোকবর্তিকা। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করলে আমি একজন সৎ, নীতিবান ও সফল মানুষ হতে পারব। তাই আমি গর্ব করে বলতে চাই- আমার প্রিয় শিক্ষক মো. বাদশা আলম।

স্কুল পর্যায় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি): দ্বিতীয় স্থান

আমার প্রিয় শিক্ষক

ছায়া নুর সাবা
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল

ভূমিকা

শিক্ষক হচ্ছেন সমাজের আলোকবর্তিকা। শিক্ষক ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। বাবা-মা আমাদের জন্ম দেন, আর শিক্ষক আমাদের মানুষ করে গড়ে তোলেন। শিক্ষক শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই দেন না, বরং আমাদের নীতি-নৈতিককা, আদর্শ এবং সুন্দর জীবনযাপনের পথও দেখান। আমার জীবনে অনেক শিক্ষক আছে, তবে তাঁদের মধ্যে একজন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

তাঁর পরিচয়

আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম মুজিবর রহমান স্যার। তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের ড্রইং ও কিছু শ্রেণির বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। সাধারণত তিনি চারুকলার একজন শিক্ষক। তিনি ছবি আঁকতে যেমন দক্ষ, তেমনি একজন আদর্শবান মানুষও বটে।

তাঁর ব্যক্তিত্ব

আমার প্রিয় শিক্ষক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাস পড়েন। মুখে সবসময় হাসি খেলে যায়। তিনি ক্লাসে ঢুকেই প্রথমে আমাদের খোঁজ-খবর নেন, তারপর পড়াশোনা শুরু করেন। রাস্তা-ঘাটে বা স্কুলে তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি

আমাদের খোঁজ-খবর নেন। তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, তাই আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি। তিনি কোনো দিন কোনো রকম অহংকার করেন না, বরং আমাদের সঙ্গে খুব আন্তরিকভাবে মিশে যান।

পড়ানোর ধরন

তিনি পড়ানোর সময় প্রথমে বিষয়টি সহজভাবে বোঝান এবং বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে সেটি আরও স্পষ্ট করেন। তিনি ছবি আঁকার সময় আমাদের অনেক কঠিন ছবিও সহজ করে এঁকে দেখান। তিনি সবসময় আমাদের মুক্ত হাতে অর্থা, কোনো জিনিস দিয়ে আঁকা শিখান না। প্রাকৃতিকভাবে কিভাবে ছবি আঁকা যায় তা আমাদের শেখান। উনার এ দিকটা আমার খুব ভালো লাগে। ক্লাসে কেউ না বুঝতে পারলে তিনি বিরক্ত না হয়ে, ধৈর্য ধরে বারবার বোঝান।

শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ

আমার প্রিয় শিক্ষক আমাদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। তিনি কোনো শিক্ষার্থীকে ছোট করে দেখেন না। তিনি সকলকে সমান স্নেহ করেন। তিনি সবময় আমাদের উৎসাহ দেন- 'ভালোভাবে চেষ্টা করলে তোমরা অবশ্যই সফল হবে'। জীবনে উন্নতি করবে।

তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা

তিনি শুধু পড়ানোই না, আমাদের জীবনের শিক্ষা দেন। তিনি সবসময় বলেন- 'সত্যবাদী হও, নিয়মানুবর্তী হও, আর পরিশ্রমী হও। তাহলেই তো জীবনে সফলতা আসবে।' এই কথাগুলো আমাদের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

বিদ্যালয়ে তাঁর ভূমিকা

বিদ্যালয়েল প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের উৎসাহ দেন। ফলে বিদ্যালয়ে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

আমার উপর তাঁর প্রভাব

আমি আগে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী ছিলাম না। কিন্তু আমার প্রিয় শিক্ষক আমাকে ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি সবসময় বলেছেন- 'তুমি চাইলেই পারবে।' তাঁর এই কথায় আমার মনে নতুন উদ্যম জেগেছে। এখন আমি পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছি এবং ভালো ফলও করেছি।

শিক্ষকের ত্যাগ

তিনি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। নিজের পরিবার নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, বিদ্যালয়ে এসে তিনি সময়মতো ক্লাস নেন এবং আমাদের পড়াশোনায় অবহেলা করেন না। তাঁর এই ত্যাগ আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

উপসংহার

আমার প্রিয় শুধু একজন শিক্ষক নন, তিনি আমার জীবনের আদর্শ। তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। আমি চাই, ভবিষ্যতে বড় হয়ে আমি যেন তাঁর মতোই একজন মানুষ হতে পারি। আমি তাঁর দীর্ঘ জীবন, সুস্বাস্থ্য এবং সুখী জীবন কামনা করি।

স্কুল পর্যায় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি): তৃতীয় স্থান

আমার প্রিয় শিক্ষক

মুসবিতুল ইমাম নীরদ
৮ম শ্রেণি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল

ভূমিকা

শিক্ষক হলেন জাতির দিশারি। যিনি কেবল বইয়ের জ্ঞানই দেন না, বরং একজন মানুষকে সঠিক পথে চলতে শেখান, জীবনের মূল্যবোধ বোঝান এবং চরিত্র গঠনের দিক নির্দেশনা দেন। পৃথিবীর সকল মহৎ পেশার মধ্যে শিক্ষকতা এমন একটি পেশা, যা কেবল জ্ঞান বিতরণ করে না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলো ছড়িয়ে দেয়। আমারও একজন প্রিয় শিক্ষক আছেন, যিনি আমার জীবনকে আলোকিত করেছেন, আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সবসময় সৎ ও সাহসী হতে শিখিয়েছেন। তিনি হলেন আমার প্রিয় শিক্ষিকা শেফালী সরেন ম্যাডাম।

শেফালী ম্যাডামের ব্যক্তিত্ব

শেফালী সরেন ম্যাডাম আমাদের বিদ্যালয়ের একজন অত্যন্ত সম্মানিত শিক্ষিকা। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একধরনের মাধুর্য রয়েছে। তিনি খুব সাহসী, সৎ ও অকপট মানুষ। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় সরব থাকেন এবং আমাদেরকেও অন্যায় না মানার শিক্ষা দেন। ম্যাডাম কখনো ভয় পান না যত বড়ই সমস্যা হোক না কেন, তিনি শান্তভাবে তা মোকাবিলা করেন। তাঁর সরলতা এবং সততা তাঁকে সবার কাছে বিশেষ করে তুলেছে।

শিক্ষাদানের ধরন

ম্যাডামের পড়ানোর ধরন খুব আকর্ষণীয়। তিনি কখনো শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। বরং জীবনের উদাহরণ, গল্প, ঘটনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়গুলো আমাদের সহজে বুঝিয়ে দেন। ফলে ক্লাসে আমরা কখনো বিরক্ত হই না, বরং মনোযোগ দিয়ে শুনি। তিনি আমাদের শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্যও প্রস্তুত করেন।

সাহসিকতার শিক্ষা

ম্যাডামের সবচেয়ে বড় গুণ হলো তাঁর সাহসিকতা। তিনি আমাদের সবসময় বলেন, 'সত্যের পথে থাকতে কখনো ভয় পেয়ো না।' জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তিনি আমাদের উৎসাহ দেন। এমনকি বিদ্যালয়ের ভেতরে কোনো অনিয়ম হলে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে তা তুলে ধরেন। তাঁর এই সাহসী মানসিকতা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

সততা ও মানবিকতা

শেফালী ম্যাডাম অত্যন্ত সৎ ও মানবিক হৃদয়ের অধিকারী। তিনি সবসময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালোবাসা দেখান। যাদের পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল, তাঁদের বই-খাতা বা ফি নিয়ে সাহায্য করেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, একজন মানুষের আসল পরিচয় তার সততা ও মানবিকতায়। তাঁর ভালোবাসা ও সহানুভূতির কারণে আমরা তাঁকে একজন অভিভাবকের মতোই মনে করি।

কঠোরতা ও আন্তরিকতা

যদিও ম্যাডাম খুব মমতাময়ী, তবে শৃঙ্খলার ব্যাপারে তিনি কঠোর। ক্লাসে কেউ পড়াশোনায় অবহেলা করলে তিনি তা একদম সহ্য করেন না। তবে শাসনের মধ্যেও থাকে আন্তরিকতা। তিনি সবসময় বলেন, 'তোমাদের শাসন করি তোমাদের ভালোর জন্যই।' তাঁর এই আন্তরিক কঠোরতা আমাদের পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলে।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

শেফালী ম্যাডাম আমাদের জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জীবন শুধু নাম-ডাক বা ধন-সম্পদের জন্য নয়, বরং সৎভাবে বাঁচা এবং অন্যকে সাহায্য করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।' তাঁর কথা আমাদের

হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, ছোট ছোট সৎ কাজই মানুষের জীবনকে মহৎ করে তোলে।

শিক্ষক দিবসে শ্রদ্ধা

শিক্ষক দিবস আমার কাছে একটি বিশেষ দিন, কারণ এই দিনে আমি আমার প্রিয় শিক্ষিকা শেফালী সরেন ম্যাডামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পারি। তিনি কেবল একজন শিক্ষক নন, বরং একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর নিরলস পরিশ্রম এবং ভালোবাসার কারণে আজ আমরা অনেকেই জীবনে সঠিক পথে চলতে পারছি। এই দিনে আমি তাঁকে জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা।

অনুপ্রেরণার উৎস

শেফালী ম্যাডাম আমার কাছে কেবল একজন শিক্ষিকা নন, তিনি আমার জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস। যখনই আমি কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, তাঁর শেখানো সাহসিকতার শিক্ষা আমাকে শক্তি জোগায়। তাঁর মতো হতে পারা হয়তো কঠিন, কিন্তু তাঁর দেখানো পথে চলতে পারলেই জীবনকে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব।

উপসংহার

আমাদের জীবনে অনেক মানুষ আসে, কিন্তু কয়েকজনই হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে থাকেন। আমার প্রিয় শিক্ষক শেফালী সরেন ম্যাডাম তাঁদের মধ্যেই একজন। তিনি সাহস, সততা, মানবিকতা ও শিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি গর্ব করি, এমন একজন মহান শিক্ষিকা আমার জীবনের দিশারি। আমি সবসময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁর শিক্ষা জীবনভর অনুসরণ করার চেষ্টা করব।

স্কুল পর্যায় (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

আদর্শ শিক্ষক

মোছা. দিশা খাতুন
দ্বাদশ শ্রেণি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল

ভূমিকা

শিক্ষক হলেন জাতির আত্মার প্রকৃত নির্মাতা। তিনি মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেন ও তাকে মানবিক, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। জাতির অগ্রগতি মূলত নির্ভর করে শিক্ষকদের মানের উপর। একজন্য বলা হয়ে থাকে 'একজন আদর্শ শিক্ষক হাজারো আলোকবর্তিকা জ্বালাতে পারেন।'

প্রতি বছর ৫ই অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এই দিনটি শিক্ষকদের অবদানকে স্মরণ করার পাশাপাশি একজন আদর্শ শিক্ষকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। জাপানের একটি আদর্শ প্রবাদ আছে, 'better than a thousand days of dilligent study is one day with a geat teacher'.

আদশ শিক্ষক

আদর্শ শিক্ষক কেবল পাঠদানকারী নন, তিনি হচ্ছেন শিক্ষার্থীর আদর্শ বন্ধু, দিকনির্দেশক, পথপ্রদর্শক। একজন শিক্ষক তখনই আদর্শ হয়ে ওঠেন যখন তিনি- নিজের জ্ঞান, নীতি, আচরণ দিয়ে শিক্ষার্থীর সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিপুল বিদ্যাচর্চা তো বটেই, সাথে শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনেও মনোযোগ দেন। জীবনের ছোটখাটো কাজে শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করেন ও ভবিষ্যতের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন।

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি

একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে বিভিন্ন গুণ থাকা জরুরি। যেমন-

সততা: শিক্ষক সর্বদা সত্যবাদী ও নৈতিক জীবনের অনুশীলনকারী হবেন।

সহানুভূতি: তিনি শিক্ষার্থীর দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করবেন ও তাদের পাশে থাকবেন।

ধৈর্য: দুর্বল বা ধীর শিক্ষার্থীদের প্রতিও সমান যত্নশীল যা করেন।
সৃজনশীলতা: শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য নতুন কৌশল প্রয়োগ করবেন।
প্রেরণাদাতা: শিক্ষার্থীর মধ্যে লক্ষ্য স্থির রাখার মানসিকতা তৈরি করবেন।
নেতৃত্বগুণ: সমাজে সৎ ও যোগ্য নাগরিক তুলতে নেতৃত্ব দেবেন।
আচরণে দৃষ্টান্ত: কথায় নয়, কাজে তিনি প্রশাণ করবেন কীভাবে সৎ ও আদর্শ মানুষ হওয়া যায়।

আদর্শ শিক্ষক সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন যে, 'He has served his nation in many capacities. But love above all he is a great teacher from whom all of us have learnt much and will continue to learn'.

Education International মূলত মানসম্মত শিক্ষার মূল উপাদান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তিনটি বিষয়কে।
১. মানসম্মত শিক্ষক;
২. মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ;
৩. মানসম্মত পরিবেশ।

ইতিহাসে আদর্শ শিক্ষকের দৃষ্টান্ত
বাংলা সমাজে অনেক আদর্শ শিক্ষক রয়েছে। তারা যেমন বাংলা সাহিত্য ও সমাজকে করেছেন আলোড়িত তেমনি বিশ্ববাজারে অনেক প্রশংসায় ভেসেছেন।

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর শিক্ষা ও সংস্কারের অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা রাখেন।
- ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন।
- ড. কুদরত-ই-খুদা- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন।
- ড. আনিসুজ্জামান- তিনি শুধু শিক্ষকই নন, ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক।

তাদের জীবন ও কর্মপ্রবাহ প্রমাণ করে, আদর্শ শিক্ষক সমাজ ও জাতিকে নতুন পথ দেখাতে সক্ষম।

আদর্শ শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা
একজন আদর্শ শিক্ষক একটি কর্ণধার। তিনি শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান দেন না, বরং একজন মানুষকে সৎ, নৈতিক, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। এজন্যই শিক্ষককে সমাজে 'দ্বিতীয় পিতা-মাতা বলা হয়। তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি-

১. দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা: একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ বিশেষভাবে বিবেচ্য। তিনি বা তারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করে তা সমাধান করেন।

২. চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবিক গুণাবলি: তাদের চরিত্র সুন্দর ও আনন্দের পূজারি। তারা কখনই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। অহংকার যে পতনের মূল তা তারা সবসময় শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরেন। এগুলো তারা নিজেদের জীবন ও কর্মে সবসময় প্রতিফলন ঘটনা।

৩. পরিশ্রমী ও সৎ: তিনি ছিলেন সৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি সৎ পথে থেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে ইবাদত হিসেবে জ্ঞান দান করবেন। আর এই সুশিক্ষা দানের জন্য শিক্ষককেই বেশি অধ্যয়ন করতে হয় ছাত্রের থেকে। ছাত্রদের কোনো সমস্যায় বিরক্তি প্রকাশ না করে তা যত্নসহকারে বোঝান।

৪. মানুষের প্রতি ভালোবাসা: ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে এই শিক্ষকেরা ভালোবাসে। এদের সহজ সরল জীবনযাপন যে কারও মনকে আলোড়িত করে দিবে।

৫. সাহিত্যিক ও দার্শনিক: গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করে ইতোমধ্যে তিনি সুনাম কুড়িয়েছেন। তার লেখাতে তার ব্যক্তিগত জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। সদা হাস্যোজ্জ্বল এই প্রিয় মানুষ দেশ ও জাতির জন্য নিঃসন্দেহে অনেক গর্বের।

৬. একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব: প্রচুর অধ্যয়নের ফলে তার মধ্যে নিজস্ব বোধের জন্ম হয়েছে। তাদের শিক্ষাদান বিজ্ঞানসম্মত। সিলেবাস ও কোর্স সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ক্লাসে পঠিত বিষয়সমূহ সহজ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য বাসত্ব জীবনের পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন। তাদের হাসিমুখের উপদেশ আমার মতো সমস্ত শিক্ষার্থীর মনের উপর ছাপ রেখে দেয়।

৭. আদর্শ ব্যক্তিত্ব: উচ্চ ডিগ্রিধারী হয়েও শিক্ষকতার মতো মহান পেশাকে বেছে নিয়ে মহৎ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মাঝে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে সচেতন করে তোলাই ছিল একমাত্র ব্রত।

শিক্ষার্থীর জীবনে আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব

১. একজন ভালো শিক্ষক শিক্ষার্থীল আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
২. নৈতিক শিক্ষা দিয়ে অপরাধপ্রবণতা কমানোর চেষ্টা করেন।
৩. শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করেন।
৪. শিক্ষার্থীর মনে এমন বীজ বপন করে যা পরবর্তীকালে সফল জীবন গড়তে সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের ইউনেস্কো ও আইএলও ১৯৬৬ সালে 'Recommendation concerning the status of Teachers' প্রণয়ন করে, যেখানে শিক্ষকের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। এরই ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে ৫ অক্টোবরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ঘোষণা করা হয়। আজ বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও বেশি দেশে দিবসটি পালিত হয়। বিভিন্ন দেশে শিক্ষক সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছেন। যেমন-

- **স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি:** একসময় যেখানে স্বাক্ষরতার হার ছিল ২৫% এর নিচে, বর্তমানে তা ৭৫% ছাড়িয়েছে। এর কৃতিত্ব মূলত শিক্ষক সমাজের।
- **মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রগতি:** শিক্ষকরা সমাজে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়েছেন, ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে।
- **ডিজিটাল শিক্ষা:** করোনাকালে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষকরা নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন।

মূলত আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে William Arthur Ward বলেছেন, 'The mediocre tacher tells. The Good teacher explains. The Superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.'

শিক্ষক সমাজের সমস্যা

তবে বর্তমানে শিক্ষক সমাজের কিছু সমস্যা বিদ্যমান। যেমন-
ক. পর্যাপ্ত বেতন ও ভাতা না পাওয়া।
খ. প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত।
গ. অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভাব।
ঘ. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা।
ঙ. সামাজিক মর্যাদার ঘাটতি।

সমাধানের উপায়

ক. শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো।
খ. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন।

গ. শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো।
ঘ. তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো।
ঙ. সামাজিক পর্যায়ে শিক্ষকদের সম্মান দেওয়া।

তাই আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, বলতেই হয়, 'It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge'

উপসংহার

একজন আদর্শ শিক্ষক হলেন জাতির সত্যিকারের নির্মাতা। তিনি যেমন শিক্ষার্থীর জীবন আলোকিত করেন, তেমনি সমাজ ও দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে দেন। তাই আমাদের শপথ হোক-

- ✓ শিক্ষককে সম্মান জানানো;
- ✓ তার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা;
- ✓ সুশিক্ষিত ও আদর্শ জাতি গঠনে একত্রে কাজ করা।

সঞ্চালনা: প্রফেসর মুর্শিদা ফেরদৌস বিনতে হাবিব